তত্ত্বসন্দর্ভমালা।

(বিধানতত্ত্ব।)

প্রথম ভাগ।

"বদন্তি তত্তং বিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা।

১৮১৫ শক, ভাদ্র।

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, পি, কে, দত্ত দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।]
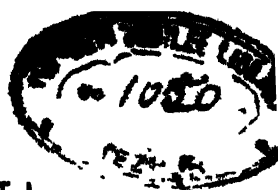
বিজ্ঞাপন।

অনেকে বহুকাল ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও নববিধান-মণ্ডলীর অন্তর্গত থাকিয়াও বিধানতত্ত্ব ও মত বিশ্বাসাদিসম্বন্ধে ভ্রম ও কুসংস্কারমুক্ত নহেন। তাহার কিছু কিছু অপনোদন হয়, এই উদ্দেশ্যে কিয়দ্দিন হইল "ধর্ম্মজীবনের পত্তনভূমি" ইত্যাদি শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্বপত্রে প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া অনেক বন্ধু লেখকের নিকটে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং এরূপ প্রবন্ধ পাঠে লোকের ভ্রান্তি বিদূরিত ও বহু উপকার হইবে, এই ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। এই প্রকার উৎসাহের কথাশ্রবণে সেই প্রবন্ধগুলির কোন কোন অংশের অল্প পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল। সময়ে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকটন করিবার ইচ্ছা রহিল।

লেখক।

সূচীপত্র।

তত্ত্বসন্দর্ভমালা।

ধর্ম্মজীবনের পত্তনভূমি।

ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাজনদিগের জীবন আলোচনা করিলে এরূপ জানা যায় যে, প্রথমতঃ তাঁহাদের পাপ বোধ হয়, তজ্জন্য অনুতাপ হয়, অনুতাপ প্রযুক্ত তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া মুক্তির প্রার্থী হন, সাধন ভজন অবলম্বন করেন, তাহাতে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে নবজীবন প্রদান করে। মত, বুদ্ধি ও চিন্তার পথ আশ্রয় করিয়া কেহ উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। চিরকাল ঈশ্বরগত প্রাণ বিশ্বাসী লোকেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। "অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত" অনুতাপই ধর্ম্মজীবনের পত্তনভূমি, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। যিহুদা দেশে মহর্ষি ঈশা "স্বর্গ রাজ্য আগমন করিতেছে" এই সুসমাচার প্রচার করার পূর্ব্বে মহর্ষি "যোহন অনুতাপ কর, স্বর্গীয় জীবন লাভ করিবে।" এই মহাবাক্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইয়াছেন। অনুতাপ করাইয়া স্বর্গীয় জীবনের জন্য লোকদিগকে প্রস্তুত করিতেই দেবাত্মা ঈশার ধর্ম্মপ্রচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেই স্বর্গের কৃপাবারি ধারণ করিবার উপযুক্ত হয়, অন্যথা পাপকণ্টকাকীর্ণ কঠিন হৃদয়ভূমিতে ব্রহ্মকৃপার সঞ্চার হইলেও বিশেষ ফল

লাভ হয় না। প্রকৃত অনুতাপ হইলে হৃদয় কোমল ও বিনম্র হয়, পাপবাসনা পাপপ্রবৃত্তি দগ্ধ হইয়া যায়, বিষয়ে বিরাগ ও ব্রহ্মে অনুরাগ জন্মে। সুতরাং তখন দেবভাব পরিত্রাণার্থীর অন্তরে স্থান পরিগ্রহ করে; ভক্তি, প্রেম ঈশ্বরানুগত্য তাঁহার আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া উঠে। ভগবান্ উজ্জ্বলরূপে স্বীয় মুখশ্রী তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন, এবং সুমধুর বচনে তাঁহার হৃদয়কে অমৃতসিক্ত করিয়া থাকেন। যে ক্ষেত্রের কণ্টক ও আবর্জ্জনাপুঞ্জ দগ্ধ ও তাহা কৃষ্ট ও সারসংযুক্ত হইয়াছে, আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হইয়া সেই ক্ষেত্রকেই সরস ও উর্ব্বর করিয়া তোলে, পরে উহাই প্রচুর শস্যশালী হয়। কণ্টকাকীর্ণ কঠিন উচ্চ ভুমির উপর বর্ষব্যাপী উপর্য্যুপরি বারিবর্ষণ হইলেও উহা উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় না ও ফল শস্য উৎপাদন করে না। মানবজীবনে ঈশ্বরের কৃপাবারির ফলোপধায়িকতা হওয়া না হওয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। জীবন অনুতাপে ও সাধনায় ভগবৎকৃপা ধারণের উপযুক্ত না হইলে সহস্র বক্তৃতা ও উপদেশশ্রবণে ও সদ্দৃষ্টান্তদর্শনে কিছুই হয় না, পাপানুরক্ত বিষয়াসক্ত গর্ব্বিত অন্তর সে সকল একেবারে অগ্রাহ্য করে। অনুতপ্ত ও প্রস্তুত জীবন আবার একটি পাখীর গানে প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়া ভগবানের চরণে আকৃষ্ট হয়। একজন মোসলমান সাধুপুরুষ প্রতি সপ্তাহে উপদেশ দান করিতেন, তাঁহার উপদেশের সভায় সহস্র সহস্র ধনী, মানী, জ্ঞানী, পণ্ডিত উপস্থিত হইতেন। এক দিন তাঁহার এক জন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য এতাধিক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হন, তাহাতে কি আপনার আনন্দ ও উৎসাহ হইতেছে

না? এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত সাধুপুরুষ বলিলেন, বিষয়াসক্ত ধনী মানী পণ্ডিত লোকদিগের সমাগমে আমার কিছুমাত্র আনন্দ ও উৎসাহ হয় না। আমি একজন পবিত্রাণার্থী অনুতাপিত দীনাত্মা পাইলে আনন্দিত হই। তিনি আমার উপদেশ বুঝিতে পারিবেন ও তাঁহার জীবনে উহা ফলপ্রদ হইবে। সুবিখ্যাতা মোসলমান তপস্বিনী রাবেয়া বসোরা নগরে যখন উপদেশদানার্থ সভাতে উপস্থিত হইতেন, যে পর্য্যন্ত তাপসবর হোসন সমাগত না হইতেন তিনি একটী কথাও বলিতেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। একদা হোসন আগমন করেন নাই, উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য শত শত ধনী জ্ঞানী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, রাবেয়া একটী কথাও বলিতেছেন না, ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া এক ব্যক্তি রাবেয়াকে বলিল যে, এত জ্ঞানী মানী সম্ভ্রান্ত লোক আপনার উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত আছেন, এক জন সামান্য ফকির আসেন নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহা শ্রবণ করিয়া রাবেয়া বলিলেন, "হস্তীর উদরের জন্য যে শরবত, তাহা আমি পিপীলিকার মুখে কেমন করিয়া অর্পণ করি।"

অতএব পবিত্রাণার্থী অনুতপ্ত আত্মাতেই উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ সকল ফলপ্রদ হয়, তাহাতে সে অধিকতর স্বর্গাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিয়াও ঈশ্বরকৃপায় অনেকের মনে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয়ে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মে। একদা কলিকাতা সমাজে এক জন বন্ধু দর্শকরূপে উপস্থিত হন। তখন প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীতে আসীন ছিলেন। "পাপীর কি গতি হইবে?" এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ হয়। মহর্ষিমুখে এই উপদেশ শুনিয়া সেই

বন্ধুর অন্তরে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে। তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্মরণ হইতে থাকে, তাহাতে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। তিনি বলিয়াছেন যে, উপাসনান্তে আমি গৃহের ত্রিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে পারিতেছিলাম না, চরণ কাঁপিতেছিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে-ছিলাম; প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া বহু কষ্টে নামিয়াছিলাম। সেই হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়া পরমোৎসাহ ও প্রেমের সহিত ভগ-বন্মহিমা দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়ান। মহর্ষির উপদেশ শুনিয়া সমাজে উপস্থিত পাঁচ শত লোকের কিছুই হইল না, কিন্তু দর্শকরূপে উপস্থিত এক জন লোকের অকস্মাৎ জীবনের পরিবর্ত্তন হইল। ইহা কেবল পরিত্রাতা বিধাতার বিচিত্র লীলা। ইহা ধ্রুব সত্য যে, অনুতাপ না হইলে আত্মা পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয় না, প্রকৃত বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয় না, সুতরাং অধ্যাত্ম রাজ্যে তাহাব প্রবেশই হইতে পাবে না। অতএব অনু-তাপই ধর্ম্মজীবনের পত্তনভূমি।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণ অনুতাপের পথ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্য ইহাঁদের জীবনে বিশেষ কোন পরি-বর্ত্তন দেখা যায় না, নব জীবনের আলোক প্রকাশ পায় না। পঁচিশ বৎসরের ব্রাহ্মকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই পুরা-তন ভাব ও রুচি তাঁহার চরিত্রে এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া মতের সঙ্গে মিলিয়াছে ও ভাল লাগিয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম

আশ্রয় করেন। পাপবোধে কষ্ট বোধ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত পরিত্রাণার্থী হইয়া ব্রাহ্ম সমাজে আসেন না, তজ্জন্য প্রায়ই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাভিমানী বা জ্ঞানগর্ব্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে কিছু দিন পরে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান, ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘোরতর উপাসক হন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যথার্থ দীনাত্মা লোক কোথায়? মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে, "দীনাত্মারা ধন্য, স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।" দীনাত্মারাই স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। পাপবোধ হইয়া অনুতাপের সঞ্চার না হইলে প্রকৃত পক্ষে আত্মা দীন হয় না। সাধু কবির বলিয়াছেন, "যে জন বলে আমা অপেক্ষা সকলে ভাল, আমি সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, তিনিই আমার মিত্র।" সাধু ফরিদ বলিয়াছেন, "যদি তোমার শত্রু তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে, তুমি তাহার বাড়ীতে যাইয়া তাহার পদ চুম্বন করিও।" এরূপ দীনাত্মাই বাস্তবিক পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম লাভ করিবার অধিকারী হয়। বিনীত আত্মাতেই ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বিনীত ও দীনাত্মা না হইলে হরিনাম করিবার অধিকার হয় না। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি।" অর্থাৎ তৃণের ন্যায় নীচ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। অধিকাংশ ব্রাহ্মের অবস্থা তাহার বিপরীত। আমি বড় অন্যে ছোট, আমি অন্যের নিকটে নত হইব কেন? তাঁহাদের এই ভাব। কেন না তাঁহারা নিজের পাপ ও অন্যের সদ্‌গুণ দেখিতে অন্ধ। ঈদৃশ আত্মাতে দেব ভাবের অবতরণ

কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? স্বার্থ অভিমান যেখানে, সেখানে প্রকৃত পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম বহু দূরে। অনুতাপের অভাবে এক প্রকার লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কোন রূপে জীবন যাপন করা যায়। তাহাতে পাপ জীবন, পার্থিব জীবনের বিনাশ ও নবজীবনের সঞ্চার হয় না। আমাদের আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পাপবোধ কেমন তীক্ষ্ণ ছিল, পাপের জন্য তাঁহার কেমন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল, তাঁহা কর্ত্তৃক বিবৃত জীবন বেদের পাপ বোধ অধ্যায় হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

* "মনের ভিতর আপনাকে যদি অধিক ভালবাসি, অন্যকে ভালবাসা যদি কম হয়, আত্ম সুখের প্রতি যদি অধিক দৃষ্টি পড়ে, তবেই স্বার্থপরতার পাপে পাপী হইলাম। ভিতরে এত লম্বা দীর্ঘাকৃতি পাপাকৃতি দেখি, ঠিক্ যেন নরকের কীট কিলবিল করিতেছে। এখনও জানি প্রত্যহ এক শত পাপের কম করি না। গণনা যদি করি, এ জীবনে কত পাপ করিয়াছি, এই ৪৪ বৎসরে দশ লক্ষ পাপ করিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনে পাপ বোধ এত ভয়ানক যে, ছোট ছোট পাপও মন ধাঁ করিয়া ধরিয়া ফেলে। সেই পাপ বোধ কষ্ট দেয়।" "বন্ধু, যেমন অন্ধকারের কথা বলিলাম তেমন আলোকের কথাও বলিলাম। যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক, যেমনই ছটফট করিবে অমনি শান্তি দেবী আসিয়া তোমাকে শান্তি দান করিবেন।"

অতএব আমরা যেন ধর্ম্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধান করি, নানা উপায়ে বিবেককে তীক্ষ্ণ করিয়া পাপ বোধ করিতে যত্নবান্ হই। প্রকৃতরূপে পাপ বোধ হইলে তজ্জন্য অনুতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা অবশ্য হইবে। তাহা হইলেই শান্তি-বারি বর্ষিত ও নব জীবনের অভ্যুদয় হইবে। "যে ব্যক্তি অশ্রু-

পাত করিয়া বপন করে সে আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে।" কাতর প্রাণে এস ভগবানের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি যেন দিব্য আলোকে আমরা স্ব স্ব পাপ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত ও বিনীত হই। জন্মসিদ্ধ আজীবন শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক এমন সাধু কে আছেন যে, অনুতাপের প্রয়োজন হইবে না?

পরিত্রাণের শাস্ত্র।

খ্রীষ্টবাদিগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বলেন, খ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর, দীক্ষা গ্রহণে খ্রীষ্টাশ্রিত হও, এক্ষণই পরিত্রাণ পাইবে। আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি। নবদীক্ষিত খ্রীষ্টান বালক যুবক পর্য্যন্ত "আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি" এইরূপ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে। ইহা এক সামান্য প্রলোভনের কথা নহে। পরিত্রাণ ব্যাপারটি কি? কোন্ অবস্থাকে পরিত্রাণ বলে, হয়তো সে তাহা কিছুই বুঝে না, প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারিবে না। প্রভু যিশু ত্রাণকর্ত্তা, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, অতএব পরিত্রাণ পাইয়াছি, এই তাহার সাধারণ সংস্কার হইবে। ইহাতেই সে পরিত্রাণ পাইয়াছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে ও অন্যকে উপদেশ দিতে উৎসাহী হইয়া থাকিবে। [১] হিন্দুরা বলেন, যাগ যজ্ঞ কর, বলি উপহার ইত্যাদি দানে দেব দেবীকে সন্তুষ্ট কর, পরিত্রাণ পাইবে, পুনর্জ্জন্ম হইবে না, স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতে আসন প্রাপ্ত হইবে, সুরাঙ্গনাগণ তোমার সেবা করিবেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম না হওয়া, [২] এবং স্বর্গলোকে নিত্যকাল ইন্দ্রিয়

সুখসম্ভোগ করাই মুক্তি। ধর্ম্ম শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে পরিত্রাণবিষয়ে উচ্চমত থাকিলেও সাধারণ পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর নিকটে তাহা অপরিজ্ঞাত। মোসলমানেরা বলেন, পুত্তলপূজা ও নরপূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক "লা এলাহ্ এল্লেহা মোহম্মদ রসুলাল্লাহ্" এই কলেমা পড়িয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, পুনরুত্থানাদি মত স্বীকার কর, প্রত্যহ পাঁচ বার নমাজ পড়, যথাবিধি রোজা পালন ইত্যাদি কর, "নজাত" (পরিত্রাণ) পাইবে, অন্য কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী সাধুলোকেরা প্রলয় কালে কবর হইতে সমুত্থিত হইয়া নিত্য স্বর্গে যাইয়া বাস করিবেন, সুরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা সেবিত হইবেন, মোসলমানদিগের মতে সাধারণতঃ ইহাই পরিত্রাণ লাভ বা স্বর্গভোগ। কাফের লোকেরা অর্থাৎ অনেকেশ্বরবাদী পৌত্তলিকগণ চিরনরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহাই নরকদণ্ড।

নববিধানে পরিত্রাণের শাস্ত্র অন্য রূপ। পরিত্রাণ কোন বাহ্যিক স্থূল বস্তু বা সীমাবদ্ধ কল্পিত অবস্থা নহে। এই ধর্ম্মে পরিত্রাণের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। আমি পরিত্রাণ পাইয়া বসিয়াছি, এই কথা কেহ বলিতে পারেন না। প্রকৃত অনুতাপ হইতে জীবনে পরিত্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহার পূর্ণতা বা শেষ কোন কালে হইয়া উঠে না। মুক্তি বাহিরে নয়, অন্তরে। আমরা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করি। অতএব মুক্তির ব্যাপারও অনন্ত। পরিত্রাণের দুইটী অবস্থা, এক অবস্থা অভাব পক্ষে, আর একটী ভাব পক্ষে। পাপপরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, রিপুদমন, সংসারে বিরাগ, ভোগে নিঃস্পৃহা ইত্যাদি এ সকল অভাব পক্ষে; ঈশ্বরে অনুরাগ ভক্তি, প্রেমের সঞ্চার,

ভগবদ্দর্শন শ্রবণ ও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন ইত্যাদি ভাব পক্ষে পরিত্রাণের অবস্থা। "ঈশ্বর ভগ্ন আত্মার নিকটে থাকেন, তিনি অনুতাপিত আত্মা সকলকে পরিত্রাণ করেন।" এই প্রবচনের তাৎপর্য্য এই যে ভগ্ন ও অনুতাপিত আত্মার নিকটে ঈশ্বর প্রকাশিত হন, এবং ঈদৃশ আত্মাতে পরিত্রাণের কার্য্য আরম্ভ করেন। আমার কতকগুলি কুঅভ্যাস ছিল, আমি পরস্বাপহরণ ও সুরা পান করিতাম, এক্ষণ সেই সকল দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহা বলিতে পারি না। অনেক লোক দুই চারিটি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, ইহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়স্থ অনেক লোক এই ভ্রমে পড়িয়া প্রতারিত হইতেছেন। উন্নতির যেমন অন্ত নাই, এক প্রকার বলিতে পারা যায় যে, পাপেরও অন্ত নাই। আমি চুরি নরহত্যাদি করিলাম না, তাহাতে আমি নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা হইলাম, ইহা কেমন করিয়া বলিতে পারি? চুরি না করিলাম, কিন্তু আমার পরস্বাপহরণে স্পৃহা হয়, পরদ্রব্যে লোভ হয়, ভ্রাতা ভগিনীর অনিষ্ট সাধনে মন ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম, অভাব পক্ষেও পরিত্রাণ পাইলাম। অন্তরে পাপপ্রবৃত্তির প্রবলতা সত্ত্বে আমি পবিত্রাণ পাইয়াছি, এরূপ বলা বাতুলতামাত্র। এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কত পাপ অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। সাধনবিহীন স্থূল দর্শীর চক্ষে তাহা সহজে ধরা পড়ে না। কুচিন্তা, অপ্রেম, স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস ইত্যাদি শত শত পাপ যাহা অন্যের চক্ষে প্রায় পাপ বলিয়া প্রকাশ পায়

না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু লোকদিগের নির্ম্মল দৃষ্টিতে সে সকল স্থূল পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যতই আত্মার ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ হয় ততই পাপ বোধ অভাব বোধ প্রবল হইতে থাকে। একটু অবৈরাগ্য একটু শুষ্ক ভাব উন্নত আত্মার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে, তিনি সেই সকলকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন। ভগবদ্ভক্ত মহাজন ভগবানের আলোকে দিন দিন নূতন নূতন পাপ দেখিয়া অস্থির হন। তাহার শেষ কোথা? আবার আত্মার অনন্ত উন্নতি, অনন্ত ঈশ্বরকে লইয়া পরিত্রাণের ব্যাপার, ভাবপক্ষেও শেষ নাই। অনন্তকাল ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে, তাঁহার নৈকট্য এবং তাঁহার সঙ্গে যোগ দিন দিন গাঢ়তর ও গভীরতর হইবে, কখন নিঃশেষিত হইবে না। মোসলমানদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ পর্য্যন্তই আত্মার উন্নতি ও অবনতির শেষ। পরকালে বিচারান্তে পুণ্যে উন্নত আত্মা স্বর্গে যাইবে, পাপে অবনত যাহারা তাহারা নরক লোকে প্রবেশ করিবে। মৃত্যুর পর আর আত্মার পুণ্য উপার্জ্জনাদি হইবে না, ইহলোকের কর্ম্মানুরূপ আত্মা পরলোকে ফলভোগী হইবে, নূতন আর কিছুই সঙ্ঘটিত হইবে না। এই মতকে আমরা ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা বলি আত্মা যখন অনন্তকাল স্থায়ী, পাপের জন্য শাস্তি-ভোগের পর তাহার অনন্ত উন্নতি হইবে, ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর আবির্ভাব আত্মা লাভ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, ক্রমশঃ তাহার অধিকতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভাব বোধ হইবে ও ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে অভাব মোচন হইতে থাকিবে। ইহাই আত্মার পরিত্রাণের অবস্থা, ইহার সীমা কোথা? আমি পরিত্রাণ

পাইয়াছি, এস তুমিও আসিয়া পরিত্রাণ লও, এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা বলা দুঃসাহসিকতা মাত্র। নববিধান সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, তাঁহার সমুদায় ব্যাপারই আকাশের ন্যায় মুক্ত ও অসীম। জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পরিত্রাণ ব্যাপারকে নববিধান সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। খ্রীষ্টবাদীরা বলেন, যিশুখ্রীষ্ট রক্তদান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে যে বিশ্বাস করে ও আশ্রয় করে সেই পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। যেমন যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহারই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, অভুক্ত ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে তাহারই জীবনে পরিত্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয় অন্যের জীবনে নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিজের নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কেবল অন্যের রক্তদানে হইবে না। যদি ঈশ্বরানুগত্য ও বাধ্যতাকে খ্রীষ্ট বা পুত্রত্ব বলি, তবে পরিত্রাণের জন্য তাহা প্রয়োজন। কিন্তু সুধু খ্রীষ্ট খ্রীষ্ট পুত্র পুত্র বলিয়া নিনাদ করিলে হইবে না, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া চাই। পুত্রত্বে পরিত্রাণের একাংশ মাত্র প্রকাশ, উহাতে আরম্ভ মাত্র। সখিত্ব দাসত্ব মহাভাব মত্ততা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার চাই।

বিধানে মণ্ডলীর একতা।

জগতের পরিত্রাতা ভগবান্ উপযুক্ত সময়ে আপনার বিশেষ চিহ্নিত ও অনুগত দাসের অন্তরকে পরিত্রাণপ্রদ নূতন বিধানের পবিত্র জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করেন। তখন সেই সাধু মহাজন পবিত্রাত্মার আলোকে আলোকিত ও স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্

হইয়া মুক্তিপ্রদ বিধিতত্ত্ব জগতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। অপর কতকগুলি লোক পরে ঈশ্বরপ্রেরণায় পবিত্র প্রচার কার্য্যে সেই মহাত্মার সহকারিতা করেন। প্রথমোক্ত মহাপুরুষকে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা প্রেরিত বলে, শেষোক্ত চিহ্নিত ব্যক্তিগণও প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হন বা প্রচারক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ইঁহা-দের অপেক্ষা প্রথমোক্ত মহাত্মার বিধানে বিশেষত্ব আছে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্ হইতে নববিধানের মূল তত্ত্ব সকল যেরূপ অবগত হন, সহকারিগণ সেরূপ নহেন। তাঁহারা প্রবর্ত্ত-কের অনুগত হইয়া চলিবেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিবেন না, ইহাই বিধাতার নিয়ম ও নির্দ্দেশ। দলবদ্ধভাবে তাঁহার অনু-সরণ করিয়া চলিলে বিধানের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহারাও অনুপ্রাণিত হন, এবং প্রভূত স্বর্গীয় বল লাভ করেন, তাহাতে বিধান অচিরে জয়যুক্ত হয়। বিধানের প্রবর্ত্তক ও তাঁহার সহকারীদিগের এক উদ্দেশ্য এক মত এক রুচি এক ভাব এক প্রণালী এক কথা এক কার্য্য এক আচার ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ, কিন্তু বিধানে তাঁহারা সকলে এক প্রাণ। যখন নিজের নিজের রুচি স্বার্থ এবং অনুচিত স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া অনুগামিগণ প্রবর্ত্তক ও নেতাকে অতিক্রম করিয়া চলেন, তখনই বিধানমণ্ডলীতে মহা অশান্তি উপস্থিত হয়, বিধানপ্রচারে বিঘ্ন ঘটে। একটি যন্ত্রের একাঙ্গ বিকৃত হইলে যেমন তাহা-দ্বারা কাজ ভাল চলে না, একটি বাজনার পাঁচটি তারের মধ্যে একটি তার বিকৃত হইলে যেমন সেই বাদ্যের সুর ঠিক হয় না, তদ্রূপ বিধানযন্ত্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ দুই এক জন লোক বিধি-বিরুদ্ধ ভাবে ও অনিয়ন্ত্রিত রূপে চলিলেই বিষম গোল উপস্থিত

হয়। আত্মত্যাগ করিয়া আপনার যাহা কিছু তৎসমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এখানে আসিতে হয়। তাহা হইলে জীবন পাওয়া যায়, এবং জীবন দানের উপায়স্বরূপ হওয়া যায়। অন্যথা বিধানের মহা মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া পরে বিষয়-বুদ্ধি ও স্বার্থকে আশ্রয়পূর্ব্বক বক্র ভাবে চলিলে নিজে জ্বালাতন হইতে হয়, অন্যকেও জ্বালাতন করা হয়। তাহাতে কিছুদিন বিধানের কার্য্যে বিঘ্ন হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের কার্য্য কখন বন্ধ থাকে না, তিনি যে অভিপ্রায় করেন তাহা পূর্ণ হয়। তিনি অন্য চিহ্নিত ভৃত্য দ্বারা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া লন। বিরুদ্ধচারীই পরিত্যক্ত ও পবিত্র মণ্ডলীচ্যুত হইয়া নিজের কর্ম্ম ফল ভোগ করেন। ছোট হরিদাস বৈরাগ্যের বিধি ভঙ্গ করিয়া এক নারীর নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া শ্রীচৈতন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পরে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ভক্তির বিধান ও বৈরাগ্য ধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইল না। প্রেরিতমণ্ডলীর অন্তর্গত জুডাস ধনলোভে শত্রু হস্তে আপনার নেতা ও গুরু শ্রীঈশাকে অর্পণ করিয়া আপনার কর্ম্ম ফল ভোগ করিল, তাহাতে যিশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি বিলুপ্ত হইল? যিশুর পরম শত্রু পল প্রভৃতিকে ভগবান্ তাঁহার পরম অনুগত ভক্ত করিয়া অলৌকিকরূপে সেই বিধানকে জগতে স্থাপন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে? তিনি অসম্ভব সম্ভব করেন, অসাধ্য সাধন করেন।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ভক্তগণ কিরূপ ছিলেন? তাঁহারা একশরীর একপ্রাণ, এক প্রকার বৈরাগ্যব্রতে ব্রতী, এক হরিনামে সকলে মত্ত। আমাদের

আচার্য্যদেব সেই দলকে তালফলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। একটি তাল ফল যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাঁস যুক্ত হয়, সেই সকল শাঁস পরস্পর এরূপ সম্বদ্ধ যে, দেখিতে যেন সকলে এক, শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত শিষ্যগণ ঈদৃশ একাঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। যেখানে ভিন্নতা ও স্বতন্ত্রতা সেখানেই পাপাসুরের পরাক্রম ও প্রসার। একতাব্রতে হজরত মোহম্মদের দল পৃথিবীতে দুর্জ্জয় হইয়াছেন, সকলের এক নিয়ম ও এক বিধি পালন, প্রতিদিন একত্র দলবদ্ধ ভাবে পাঁচ বার উপাসনা করা, একত্র প্রসঙ্গ ও পাঠ। এরূপ দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা আর কোথায় আছে? হদিসে উক্ত হইয়াছে, হজরত এরূপ বলিয়াছেন ;—

"তোমরা মহাদলের অনুসরণ কর, যে ব্যক্তি একাকী হয় সে একাকী নরকানলে পতিত হইয়া থাকে।" "এই দলের উপর ঈশ্বরের হস্ত রহিয়াছে, যে দলশূন্য হয় সে একাকী নরকানলে নিপতিত হইয়া থাকে।" "যে কোন গ্রামে বা প্রান্তরে তিন জন লোক নাই, তথায় দলবদ্ধ নমাজ হইতে পারে না। শয়তান তাহাদের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব তোমার উচিত যে দলকে আশ্রয় কর, যেহেতু নেকড়ে বাঘ যূথভ্রষ্ট ছাগ পশুকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে।"

উৎপীড়িত হইয়া যে সকল মোসলমান গৃহসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কা হইতে মদিনায় যাইয়া হজরতের সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাদিগকে মোহাজের বলে, এবং মদিনানিবাসী যে সকল মোসলমান সেই মোহাজেরদিগকে আশ্রয় দিয়া সাহায্য দান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আনুসার বলে। এই মোহাজের দল ও আনুসার দলের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ও অনৈক্য না থাকে এই উদ্দেশ্যে হজরত মোহম্মদ এক এক জন প্রধান

মোহাজেরকে এক এক জন প্রধান আনসার পুরুষের সঙ্গে বিধি পূর্ব্বক ভ্রাতৃত্বসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এক জন অন্য জনের ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত হন। একতা স্থাপনে হজরতের এতদূর দৃঢ়তা ছিল। এক ঈশ্বর, এক রসুল এক ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণকে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে মান্য করিয়া চলিবে, এক প্রকার বিধি ও এক প্রকার নিয়ম প্রণালীর অনুসরণ করিবে, ইহাতে তাঁহার প্রাণগত যত্ন ছিল। তদ্ভিন্ন দল রক্ষা ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না, এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

নববিধান ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায় চূর্ণ করিয়া এক মণ্ডলীতে পরিণত করিবেন, এই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, তাহা কোথায় সংসাধিত হইতেছে? গৃহেই নানা দল। বিধানপ্রবর্ত্তক অস্বীকৃত হইতেছেন, তাহাতেই এই গোলযোগ ও অশান্তি। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া এক এক জন স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মত ও প্রণালীর অনুসরণ করিলে কেমন করিয়া একতা রক্ষা পাইতে পারে? উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদির প্রণালীর একতায় মণ্ডলীর একতা, তদ্ভিন্নতায় ভিন্নতা উপস্থিত হয়। এস্থলে বিধান-প্রবর্ত্তকের একান্ত অনুসরণ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রত বিধি নিয়ম প্রণালী সকল পালন এবং শ্রীদরবারের আনুগত্য স্বীকার একতার ভূমি। এই মহামণ্ডলী শ্রীদরবারের নিকট নিজের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র মত ব্যক্তিগত ভাব বিসর্জ্জন করা, বিনীত হইয়া ইহার আদেশ শিরোধার্য্য করা চাই। এই মণ্ডলী ছাড়া আমি এক জন স্বতন্ত্র পুরুষ এই ব্যক্তিত্বেই ভিন্নতা ও বিচ্ছেদ হয়। শ্রীদরবারসম্বন্ধে শ্রীমৎ আচার্য্য এই বলিয়াছেন :—

এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না, এই মণ্ডলী নববিধান আসিবার

প্রণালী, এই ঘর তবে কাশী শ্রীবৃন্দাবন, জেরুজেলম্ অপেক্ষা বড়। এই ঘরের নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্গগমন।" "দরবার তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর" ইত্যাদি।

বিধানপ্রবর্ত্তক যে সমস্ত পবিত্র বিধি ব্রত নিয়ম প্রেরিতদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সকলে তাহা জীবনে প্রতিপালন করিলে আজ পবিত্র একতার রাজ্য স্থাপিত হইত, এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ও দুঃখ ক্লেশ মণ্ডলীকে ভোগ করিতে হইত না। এখানে সেই পবিত্র বিধির কিয়দংশ "প্রেরিতদিগের প্রতি বিধি" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"নূতন বিধি অবলম্বনীয়;—পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা।—আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা, প্রচারকসভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া, সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা" ইত্যাদি। "সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন একত্র ভোজন ও শয়ন।" "প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণারূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে, তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না, যে অন্ন চিন্তা বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। অন্যকে দিবে নিজে লইবে না, ধন স্পর্শ যত দূর সম্ভব পরিহার, সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, দারিদ্র্যে প্রফুল্ল থাকা।" "বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। এত দিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে, এখন হইতে আর তাহা হইবে না। তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা অন্যের অর্থ স্পর্শও করিতে পারিবে না।" "এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, আমাদের

প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটী পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা দিবেন না, ইঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে।" "পরস্পরে প্রেম কর, কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও, পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন।" "তোমরা বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপর গৌরব লইও না। আমি আমার আমায়, এ ভাব চির দিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমির স্বার্থপরতা ও অভিমান পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যত্বে নিমগ্ন কর। তোমরা তোমাদের আপনার নও।" "সর্ব্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান, এবং বিশ্বাস কর যে, উপাসনার অনিয়ম অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, অসারল্য বা শুষ্কতা মহা পাপ। উত্তর উত্তর বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতা সহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্র যোগ ও সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে।" "নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চ সাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইও না। ভক্তি সাধন করিতে গিয়া নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদায় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বল কর।" "সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে বা ভয়ে অন্য ভাব মিলিত হইতে দিবে না" ইত্যাদি।

এই সকল বিধি সকল প্রেরিত মান্য করিয়া চলিলে একতার রাজ্য স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হয়।

যুগধর্ম্ম ও সমন্বয়।

যখন পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে ঘোর ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে,

নর নারী সকল উন্মার্গগামী স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্ম ও নীতির শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সুখবিলাসে—পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, তখনই বিধাতার বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। সেই দয়াময় পতিতপাবন পিতা আপন সন্তানের পাপ সহ্য করিতে আপন স্বষ্ট আদরের পৃথিবীর দুর্গতি দর্শন করিতে পারেন না। বিপ্লব কালে তিনি এক একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়া পরিত্রাণের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন, এবং বিপথগামী সন্তানদিগকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সকল ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আপনাদের জীবনের সমুদায় উৎসাহ উদ্যম নর নারীর দুঃখ মোচন ও কল্যাণ-বর্দ্ধনের জন্য ব্যয় করেন। এমন কি তন্নিমিত্ত বিষম দুঃখ বিপদ্ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা বিধাতার আজ্ঞা সম্পাদনার্থ জগতের দুঃখরাশি স্বীয় মস্তকে বহন করেন। বুদ্ধ নানক চৈতন্য ও ঈসা মুসা মোহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজন। আমরা যত দূর অবগত আছি তাহাতে এই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, আমাদের অধিষ্ঠান ভূমি এসিয়া মহাদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম এসিয়াতে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভ্যুদয় হইয়াছে। এখান হইতেই ইয়ুরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইয়াছে। ইয়ুরোপ প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতম দেশের অধিবাসিগণ যখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন বন্য পশুবৎ ছিল, তখনও এদেশে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক বিকীর্ণ এবং ধর্ম্মের মহা মহা ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত

হইয়াছিল। পরে ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ এদেশের অলোক-সামান্য মহাপুরুষদিগের নিকটে অবনত মস্তকে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা করে। পশ্চিম এসিয়া তুরস্ক আরব প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ যুগ ধর্ম্মের বা বিধানের প্রকৃতি একপ্রকার, দক্ষিণ এসিয়া ভারত-বর্ষে অন্য প্রকার পরিলক্ষিত হয়। সচরাচর আরব তুরস্ক দেশের লোকের জীবন বীরত্বপ্রধান, ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন ভাবপ্রধান। সুতরাং সেই পাশ্চাত্য দেশে বিধানপরম্পরায় আদ্যোপান্ত বীরত্ব উদ্দীপক বিশ্বাসের ব্যাপার দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের প্রভুত্বে ও তাঁহার আদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পর্ব্বত তুল্য বাধাবিঘ্নের মধ্যে বজ্রদেহী হইয়া অটল উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তত্রত্য প্রেরিত মহাজনগণ তাঁহার আদেশ সম্পাদন করিয়াছেন। এক-মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও তাঁহার আজ্ঞা পালন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য সাধন করিতে যাইয়া সহস্র সহস্র প্রবল শত্রুর সঙ্গে অকুতোভয়ে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, বিশ্বাসবলে তাঁহারা সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া এক এক জন বীরত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছেন। নিয়ম নিষ্ঠা নীতিপালনে তাঁহারা একান্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। সে দেশ বীরত্বের ভূমি, বিশ্বাস দৃঢ় কঠোর পদার্থ, সুতরাং বিশ্বা-সকে প্রাধান্য দান করিয়া যুগ ধর্ম্ম তথায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এব্রাহিমের যুগ হইতে, সেই দেশের চরম প্রেরিত হজরত মোহম্মদের যুগ পর্য্যন্ত, তথায় যুগধর্ম্মের একই ভাব দৃষ্ট হইতেছে। তত্রত্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তদনুগামিগণ অটল বিশ্বাসের সহিত ভগবানের আদেশ পালন ও তাঁহার কার্য্য সম্পা-দন করিয়াছেন। যদিচ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও

তাঁহার আদেশ বা ইচ্ছা পালন সমুদায় পাশ্চাত্য বিধানের এই সাধারণ ভাব, তথাপি কিন্তু প্রত্যেক বিধানের আবার বিশেষত্বও আছে। ধাতু মৃৎ প্রস্তরাদি স্তরে স্তরে ক্রমে স্থাপিত হইলে পর বহু যুগান্তে ধরিত্রী যেমন জীব জন্তুর সুখবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, যুগধর্ম্মও তদ্রূপ ক্রমশঃ একটির পর একটি প্রকাশ পাইয়া মানবমণ্ডলীকে সমুন্নত অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়াছে। জীবের যেমন শৈশব বাল্য কৈশোর প্রৌঢ় যৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যুগ ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্ব প্রথমে এব্রাহিম দুর্জ্জয় বিশ্বাসবলে পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই একেশ্বরবাদপ্রচার হওয়ার বহু শত বৎসর পর পুনর্ব্বার নরপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব হইলে, মুসাদেব আবির্ভূত হইয়া একেশ্বরবাদ পুনঃ স্থাপন করেন। ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ ও বাহ্য প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন এই তত্ত্ব তাঁহা কর্ত্তৃক প্রথম বিঘোষিত হয়, এবং তিনি কঠোর নীতির শাসন মণ্ডলীতে স্থাপিত করেন। তাহার বহু শত বৎসর পর মহর্ষি যিসু যে যুগধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার সার প্রেম এবং ঈশ্বরের বাধ্যতা ও ইচ্ছাধীনতা। পরে কালক্রমে লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া পুত্তল ও ঈশ্বরপুত্র ঈসাকে লইয়া ব্যস্ত হইলে, এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কোরেশদিগের পৌত্তলিকতা ও খ্রীষ্টবাদীদিগের নরপূজার বিনাশ সাধনে করবাল ধারণ করেন, এবং মহা তেজ ও বিক্রম সহকারে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য পুনঃ স্থাপন ও তাঁহার পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, ব্রতোপাসনাদির

নিয়ম নিষ্ঠা এবং মণ্ডলীতে একতা স্থাপন; বিশেষভাবে এস্লাম বিধানের এই কার্য্য দেখা যায়। সেই পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ কয়েকটি প্রবল যুগ ধর্ম্মের মহা ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোন পরবর্ত্তীবিধান পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানকে এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে অস্বীকার ও অতিক্রম করিয়া চলেন নাই, বরং সাদরে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি ঈসা বলিয়াছেন যে, "আমি মুসার ধর্ম্ম বিনাশ করিতে আসি নাই, বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "আমি এব্রাহিমের একেশ্বরবাদকে পুনর্জীবিত করিতে আসি-য়াছি।" এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি মুসা ও ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সত্যতার সংস্থাপক। নূতন বাইবেল পুরাতন বাইবেলকে আদর করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেল তও-রাত জব্বুর প্রভৃতি তদ্দেশীয় সমুদায় প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রকে কোরাণ স্বীকার করিয়াছেন। এক সম্প্রদায়ের অজ্ঞানী লোকেরাই অন্য সম্প্রদায়ের বিধানপ্রবর্ত্তক ও বিধান শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সে দেশের এই যুগধর্ম্ম পরম্পরার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে তৎসমুদায়ে কেবল আদ্যোপান্ত অটল বিশ্বাস, তজ্জনিত অদম্য উৎসাহ উদ্যম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাবের কোমলতা অতি অল্পই লক্ষিত হয়। সে দেশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা তৎসহকারিগণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছেন, বা প্রাকৃতিক পদার্থে ঈশ্বরের মহিমা শক্তি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমপুলকিত হৃদয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিয়া-ছেন, ইহা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহাদের অসাধারণ বীরত্ব ও কার্য্যোদ্যম দৃষ্ট হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের

আদেশপালনে শত্রু কর্ত্তৃক ক্রুশে নিহত, অনলে নিক্ষিপ্ত, হিংস্র মুখে ও হস্তিপদতলে নিপাতিত, সুতীক্ষ্ণ করবালের নিম্নে স্থাপিত হইয়াছেন। সেই ধর্ম্ম বীরগণ অম্লানবদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে, প্রভুর ইচ্ছা ও আদেশ পালনের জন্য এইরূপে আত্মবলি দান করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ঋষি মহর্ষিগণ, হৃদয়ের কোমলতা ও ভাবুকতা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন বিশ্বাসপ্রধান বলিয়া প্রতীতি হয় না। সেই আদি যুগে ঋগ্বেদের সময়ে গিরিশিখরে, নদীতটে, সাগরকূলে ধর্ম্মসংস্থাপক ঋষিগণ অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতিপটে ঈশ্বরের মহিমা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে বিগলিত ও ভাবে পুলকিত হইয়া স্তবস্তুতি বন্দনা করিয়াছেন। এ দেশে প্রথমতঃ বাহ্য প্রকৃতিতে ঈশ্বরাভির্ভাব দর্শনে ভবোদ্দীপন হয়, তৎপর বৈদান্তিক যুগে আত্মাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিয়া ঋষিগণ ভাবে পুলকিত হইয়াছেন, এবং এইরূপ বলিয়াছেন।

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌজহাতি।"

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন, তিনি নিত্য; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মারসংযোগপূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।

পরে পৌরাণিক যুগে সেই ভাবের পূর্ণতা ভক্তির মত্ততায় পরিণত হয়। ভক্তজীবনে ভগবান্‌কে অবতীর্ণ দর্শন করিয়া ভক্তগণ মত্ত হইয়াছেন। ভক্তির ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীচৈতন্যের সময়ে কেবল ভক্তির

প্লাবন, মহাভাব, পুলক ও অশ্রুপাত হয়। শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরুনানকও কোমলভাব প্রেম ভক্তি জীবনে প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্থাপক বুদ্ধদেব যদিচ ধ্যান ধারণা ও প্রবৃত্তিনির্ব্বাণের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, এ ধর্ম্মে তাদৃশ সরস ভাব নাই, তথাপি কিন্তু এব্রাহিম মুসা মোহম্মদ প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ন্যায় এই বিধানে বিশ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায় না। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী, নয় বলিয়াই যেন এদেশে বদ্ধমূল হইল না। অন্য দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। এখানে সুকোমল ভাব রাজত্ব করে, বীর বিশ্বাস নয়। ভাবের মোহিনীশক্তি থাকিলেও বিপদ্ পরীক্ষার সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করে। এদেশের বিধানাশ্রিত লোক পরীক্ষাকে বড় ভয় করে, সামান্য পরীক্ষা বায়ুর হিল্লোলে সচরাচর তাঁহাদিগের পতন হয়। পাশ্চাত্য দেশের বিধানাশ্রিত লোক পরীক্ষার সংগ্রামে দুর্জ্জয়। এদেশের সাধারণ লোকের প্রকৃতিতে প্রকৃত বিশ্বাসের একান্ত ক্ষীণতা, ইহারা চঞ্চল স্বভাব লঘুচিত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সামান্য লোকেরা কাহার পরিধানে একখানা গৈরিক দেখিলে ভাবে গদগদ হইয়া পড়ে। এজন্য গৈরিক পরিধান প্রবঞ্চনার জালবিশেষ হইয়াছে। মস্তকে জটাপুঞ্জ মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুজাল এবং কণ্ঠে স্তূপাকার তুলসীমালা থাকিলে এবং সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য ও মূর্চ্ছা হইলে এদেশের লোকের চক্ষে খাঁটি অবতার হইয়া পড়িতে হয়, তাঁহার চরণে তাহারা পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে। সামান্য লোকের কেন অনেক কৃতবিদ্যের ও এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। পাশ্চাত্যভূমি আরব তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এরূপ ভাব নয়। আরব তুরস্ক প্রভৃতি

বীরত্বপ্রধান বিধানক্ষেত্রে ঈশ্বর রাজবেশে বীরবেশে প্রকাশিত, তথাকার বিধানাশ্রিত লোকেরা ঈশ্বরকে মহাপরাক্রান্ত মহিমান্বিত শাসনকর্ত্তা দণ্ডদাতা রাজাধিরাজ ও প্রভুরূপে দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত ও বিকম্পিত হইয়াছেন, সকলে তাঁহার রাজ্য স্থাপন ও আদেশ পালনে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। সেখানে "দয়াল হরি" বা "স্নেহময়ী মা' বলিয়া কেহ ভগবানকে সম্বোধন করে না, ঈশ্বরের তেজ বিক্রমের কথাই সকলে বলে। তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদনে ও আজ্ঞাপালনেই পরিত্রাণ এই সার কথা। সে দেশে পিতৃ সম্বোধন আছে বটে, কিন্তু পিতৃভাবেও পুরুষত্ব, শাসন, তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ পায়। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে মৃদু প্রকৃতি আর্য্যদিগের নিকটে পরমেশ্বর "দয়াল হরি" ও "স্নেহময়ী মা" রূপে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতেছেন। এখানকার ভক্তমণ্ডলী মা, মা, ও দয়াল হরি, দয়াল হরি, বলিয়া বিগলিত হন, কাঁদেন ও নাচেন। এই ভাব সে দেশে নাই। সে দেশে সুদৃঢ় বিশ্বাসের করবাল, এদেশে সুকোমল ভক্তির অশ্রু। সে দেশের বিধানাশ্রিত লোক পুরুষপ্রকৃতিপ্রধান, এদেশের লোক নারীপ্রকৃতিপ্রধান। দৃঢ় ও কোমল এই দুই ভাবস্রোত এসিয়া মহাদেশের দুই প্রান্তে প্রবাহিত। নববিধান এদেশে অভ্যুদিত, সুতরাং নববিধানাশ্রিত লোকদিগের জীবনেও ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়, বিশ্বাসের প্রাধান্য নয়। প্রত্যেক দেশে মানব প্রকৃতির অনুযায়ী বিধানের সমাগম হয়।

নববিধান পাশ্চাত্য দেশ ও এদেশের সমুদায় যুগধর্ম্মকে ও যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগকে গ্রহণ করেন, কাহাকেও অস্বীকার করেন না। তিনি সকলের সমন্বয়সাধনে প্রবৃত্ত। ঈশ্বর এক মাত্র

অদ্বিতীয়, তাঁহার ধর্ম্ম ও তাঁহার বিধি এক অন্যকে খণ্ডন ও অস্বীকার করিতে পারে না, তাহা হইলে তিনি মিথ্যাবাদী মিথ্যাচারী হন। এক বিধান অন্য বিধানের বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের মধ্যে গূঢ় যোগ ও সামঞ্জস্য আছে। নববিধান তাহাই প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি এব্রাহিমের একেশ্বরবাদ, মুসার নীতি, ঈশার বাধ্যতা, মোহম্মদের উদাম ও নিষ্ঠা, যোগী-দিগের যোগ, শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ এই সমুদায় গ্রহণ এবং সপার্ষদ সমুদায় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তককে স্বীকার পূর্ব্বক পর-স্পরের সম্মিলনসাধনে এক বিচিত্র পূর্ণ ধর্ম্মের প্রকাশ করিতে-ছেন। যেমন একটী রমণীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে কেহ চূণা আনিয়া রাখে, কেহ ইষ্টক, কেহ কড়িকাঠ; পরে সুনিপুণ। রাজমিস্ত্রী আসিয়া সে সকলকে গ্রহণ ও সংযোজনপূর্ব্বক বিচিত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, নববিধানের প্রবর্ত্তকের কার্য্যও সেই প্রকার। তিনি যোগীদিগের যোগ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ঈশার বাধ্যতা মোহম্মদের বিশ্বাস প্রভৃতি উপকরণ গ্রহণ করিয়া সন্তাপিত জীবের শান্তি ও আরামের স্থান বিচিত্র স্বর্গীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অন্য অন্য ধর্ম্মবিধান অপেক্ষা এস্‌লাম ধর্ম্মের সঙ্গে নববিধানের ঘনিষ্ঠ যোগ ও সম্বন্ধ। এস্‌লাম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, এস্‌লাম ধর্ম্মের মণ্ডলীর একতা, এস্‌লাম ধর্ম্মের পূর্ব্বতন বিধান গ্রন্থ ও সাধু মহাপুরুষদিগের সঙ্গে যোগ, এস্‌লামধর্ম্মের রাজভক্তি ইত্যাদি নববিধানের বীজ ও মূল তত্ত্বের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। কেবল নব-বিধানের ন্যায় সেই সকলের সার্ব্বভৌমিক ভাব নাই। কোরাণ ও হদিসের ভূরি ভূরি বচন ইহার প্রমাণ। আমরা বহু

বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এ কথার সত্যতার সমর্থন করিতে পারি।

জীবনের লক্ষ্য।

এক জন মোসলমান সাধক একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। গৃহ প্রস্তুত হইলে গুরু আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নব অট্টালিকার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এই গৃহে গবাক্ষ কেন রাখিয়াছ?" শিষ্য উত্তর করেন, "গৃহের অভ্যন্তরে বায়ু ও আলোক সঞ্চারিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে গবাক্ষ রাখা হইয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন, "বৎস, তোমার বাতায়ন স্থাপনের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ নহে, অতি নিকৃষ্ট। এই গবাক্ষপথে আজানের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নমাজের জন্য প্রস্তুত হইবে, এই লক্ষ্য করিলে ধর্ম্মসাধকের উপযুক্ত লক্ষ্য হইত। আত্মার কল্যাণ মুখ্য লক্ষ্য, শারীরিক কল্যাণ গৌণ লক্ষ্য হইবে। তুমি আত্মা অপেক্ষা শরীরকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছ। গবাক্ষপথে বায়ু ও আলোক সঞ্চার গৌণ লক্ষ্যের মধ্যে রাখিলে ঠিক হইত। দুঃখের বিষয়, তুমি গৌণকে মুখ্য করিয়াছ। যাহা আনুষঙ্গিক হইবে তাহাকে প্রধান করিয়াছ।"

লক্ষ্য ও আদর্শ অনুসারে মনুষ্যের জীবন সঙ্গঠিত হইয়া থাকে। যাহার লক্ষ্য উচ্চ ও আদর্শ মহান্, তাহার জীবনও সমুন্নত হয়, যাহার তাহা নীচ তাহার জীবনও নীচ হইয়া থাকে। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসহবাস ও ব্রহ্মচরিত্রলাভ যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তাঁহার শিক্ষা ও সাধনও সেইরূপ হয়, জীবন তদনুসারে

গঠিত হইয়া দেবত্বের জ্যোতি বিকীর্ণ করে। যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখোন্নতি ইন্দ্রিয়সম্ভোগ আপন জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার শিক্ষা কার্য্য ভাব চরিত্র তদনুরূপ, সে নীচ সংসারগতিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মসেবার জন্য জীবনকে প্রস্তুত করা যাহার বিদ্যা শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যলাভের উদ্দেশ্য, তাহার জীবন ক্রমশঃ তদনুসারে সঙ্গঠিত ও সমুন্নত হয়; যাহার শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য লাভের মুখ্য লক্ষ্য সংসারে ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, সাংসারিক সুখেরই অধিকারী হইয়া থাকে, সে মুক্তিপ্রদ উচ্চব্রহ্মজ্ঞানের কখন অধিকারী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উত্তম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আলেখ্য চিত্র করে, তাহার আলেখ্য যেমন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হয়, মন্দ আদর্শ অনুসারে চিত্র করিলে যেমন মন্দই হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার জীবনের আদর্শ উচ্চ তাহার জীবন উচ্চ হয়, যাহার আদর্শ নীচ তাহার জীবনও নীচ হইয়া থাকে। উচ্চধর্ম্ম সাধন উপদেশ বক্তৃতা উপাসনাদি করিয়াও লক্ষ্যের দোষে অনেকের তাহা বিফল হয়। সেই সকল কার্য্যে যদি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ও লোকরঞ্জন করা উদ্দেশ্য হয়, ঈশ্বরের নিকটে তাহার কোন মূল্য নাই, স্বর্গে তাহার কিছুই পুরস্কার নাই। আবার ব্রহ্মপ্রীতি লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ সামান্য গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করেন স্বর্গে তাহার মহামূল্য হয়। লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতানুসারে কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতা। লক্ষ্য উচ্চ হইলে সামান্য কাজও উচ্চ হয়, লক্ষ্য নিকৃষ্ট হইলে সংসারের দৃষ্টিতে যাহা মহৎ কর্ম্ম তাহা স্বর্গলোকে নিতান্ত হীন বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া একটী পয়সা

দরিদ্রকে দান করিলে সেই পয়সাটী ভগবান্ স্বয়ং হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন, সংসার উদ্দেশ্যে যশ খ্যাতির জন্য লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করা অপেক্ষা সেই একটী পয়সার মূল্য অধিক। যদি ঈশ্বরের প্রসন্নতালাভের সঙ্গে লোকের চিত্তাকর্ষণ ঈশ্বরসেবা ব্রতোপাসনাদির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের পূজা হইয়া থাকে, ঈশ্বরের সিংহাসনে তাঁহার পার্শ্বে মানবকে স্থাপন করা হয়। এরূপ ব্রতোপাসনাদিতে অপরাধেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্ হইবেন, তাঁহাকে অবিমিশ্র প্রীতি প্রদান করিতে হইবে। তাহা না হইলে সকলই নিষ্ফল। পারস্য দেশীয় কোন মহাকবি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে অন্ন জল গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করার একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরের সেবা করা, তোমরা মনে করিও না, খাওয়া পরার জন্য জীবন ধারণ।"

আমাদের দেশের আমাদের জাতির এমন কি পৃথিবীর এরূপ দুরবস্থা ও দুর্গতি কেন? নরনারী এরূপ সংসারের কীট হইয়া নীচ ভাবে জীবন যাপন করিতেছে কেন? লক্ষ্য নীচ বলিয়া তাহারা সংসার চায়, পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ করিতে চায়, সুতরাং জীবনও তদ্রূপ সঙ্গঠিত হয়, সহস্রের মধ্যে একজনেরও উচ্চ স্বর্গীয় জীবন আছে কি না সন্দেহ। লক্ষ্য উচ্চ না হইলে দেশের দুঃখ দুর্গতি পাপ অত্যাচার নীচতা কখন ঘুচিবে না, ধনে মানে জ্ঞানেও ঘুচিবে না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে যাহা প্রয়োজন তাহা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" বাস্তবিক স্বর্গকে লক্ষ্য কর—ভগবান্‌কে জীব-

মের লক্ষ্য কর, সমুদায় প্রাণের সহিত অন্তরের সহিত সমগ্র জীবনের সহিত তাঁহাকে প্রীতি কর, সকল দিকে কুশল কল্যাণ হইবে, ধর্ম্ম হইবে, পরিত্রাণ পাইবে, সংসারে নির্ম্মল সুখ লাভ করিবে। বর্ত্তমান যুগে নরনারী ঈশ্বরকে প্রাণ হইতে হৃদয় হইতে গৃহ সম্পত্তি হইতে বিদায় দান করিয়াছে, তাহারা আপনাদের সমগ্র জীবন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সংসারের চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে। বিধানবিশ্বাসী সেই নিগৃহীত তাড়িত ভগবান্‌কে নিজের দেহ মন আত্মাতে, গৃহে পরিবারে, অন্নে বস্ত্রে, বিষয় কার্য্যে সমুদায়ের মধ্যে সাদরে স্থাপন করিবেন। সমুদায়ের লক্ষ্য তিনি হইবেন। ভগবানের আদেশে ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে ভোজন পান শয়নোপবেশন বিষয় কর্ম্মাদি সমুদায় করিতে হইবে। "জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি, দেহ মন প্রাণ হরি" ইহা কেবল সঙ্গীতে গাহিলে হইবে না। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য করিয়া ইহা সাধনপূর্ব্বক জীবনে প্রদর্শন করিতে হইবে। ভগবান আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন্।

ব্রহ্মদর্শন।

একদা প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর স্বীয় অনুগামী ব্রহ্মোপাসকদিগকে বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা অগ্রে আপনাদিগের ঠাকুর দর্শন করিয়া প্রণাম করেন, পরে পান ভোজনাদি করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এই উৎকৃষ্ট নীতি ব্রাহ্মদিগের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মোপাসকগণ প্রত্যহ ব্রহ্মদর্শনান্তে

ভোজন পান করিবেন। হিন্দুগণ ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত নির্জ্জীব পুত্তলিকাকে আপনাদের উপাস্যদেব বলিয়া দর্শন করেন। ব্রাহ্মগণ সাক্ষাৎ বিদ্যমান জীবন্ত পরম দেবকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। ব্রহ্মদর্শন যে পর্য্যন্ত না হয় ভোজনাদি করিবেন না। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেক সাধক ব্রহ্মদর্শন না করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হন। কেহ কেহ কোন কোন দিন বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত ভোজনে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মদর্শনার্থ ধ্যান ধারণা স্তুতি বন্দনাদিতে নিরত থাকেন। এইরূপ ব্যাকুল সাধনায় অনেকের দেবদর্শন দিন দিন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মদিগের উপাস্য ঈশ্বর বাহ্য আকৃতিবিহীন। সাকার বস্তুকেই চক্ষে দেখা যায়, যাঁহার আকার নাই তাঁহার দর্শন কিরূপে সম্ভব? অনেকে এই প্রকার প্রশ্ন করেন। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি অধ্যাত্ম দৃষ্টি অবরুদ্ধ এরূপ স্থূলদর্শীর পক্ষে জড় নেত্রে জড় পদার্থ দর্শন ভিন্ন সূক্ষ্ম চিন্ময় পদার্থের দর্শন অসম্ভব হইবে আশ্চর্য্য কি? তাহা বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন হয় না, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। বরং স্থূল ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন সমুজ্জ্বল হয়। তাহার তুলনায় জড় বস্তুর দর্শনকে দর্শনই বলা যায় না। এই বাহ্য দর্শনেন্দ্রিয়যোগে কোন বাহ্য বস্তুরই প্রকৃত দর্শন হয় না, পদার্থের গুণ—তাহার বর্ণ, আকৃতি ও বিস্তৃতিমাত্র উপলব্ধ হয়। গুণের আধার মূল পদার্থকে চক্ষু বা অন্য ইন্দ্রিয় কোথায় অবধারণ করিতে সক্ষম? চন্দ্রমাদর্শনে যে সৌন্দর্য্য, সাগর দেখিয়া যে গাম্ভীর্য্য অন্তরে প্রতিভাত হয় তাহার আকার

কোথায়? অথচ সেই ভাব নিরাকার হইলেও জীবন্তভাবে প্রাণকে স্পর্শ করে। জীবাত্মা সাকার নহে, নিরাকার, উহা স্থূল দেহ নহে, হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদির সমষ্টি নহে; জীবাত্মা জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার সমষ্টি। আমি বলিতে জীবাত্মা, আমি সাকার নহি, আমি দেহ,—আমি চক্ষু, আমি কর্ণ নহি। আমার দেহ আমার চক্ষু আমার কর্ণ ইত্যাদি আমার শয্যা আমার গৃহ ইত্যাদির ন্যায় আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আমাদের দেহের কোন অংশ যদি নষ্ট হয়--চক্ষু নষ্ট হয়, কর্ণ বিকৃত হয়, তাহাতে আমার অর্থাৎ জীবাত্মার বিনাশ হয় না, আমি প্রকৃতিস্থ থাকি। হস্তপদশূন্য চক্ষুকর্ণবিহীন হইযা আমি ঠিক থাকিতে পারি। অতএব দেহ হইতে আমি অর্থাৎ জীবাত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেহ স্থূল ভৌতিক উপাদানে সঙ্গঠিত, জীবাত্মা অতীন্দ্রিয় নিরাকার চিৎ পদার্থ। জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার আকার কি হইতে পারে? জীবাত্মা কাল বা শুভ্র, দীর্ঘ বা হ্রস্ব, ইহা কেহ বলিতে পারে না। কেন না এ সকল জড় পদার্থের গুণ বা অবস্থা। চিন্ময় পদার্থ জীবাত্মা এ সকল জড়ীয় গুণের সম্পূর্ণ অতীত। বাহ্য নেত্রে দর্শন করা যায় না, কর্ণে শ্রবণ করা যায় না, অথচ সেই নিরাকার জীবাত্মাকে কে না প্রত্যক্ষ করিতেছে? আপনাকে কে না দর্শন করে? আমি, তুমি, তিনি এই জীবাত্মা সকল এক অন্যকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতেছে। অথবা জ্ঞান প্রেম বাৎসল্যাদি জীবাত্মার গুণ সকল নিরাকার, তাহা সকলে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছে। ভ্রাতঃ, তুমি আমাকে দেখ, আমি তোমাকে দেখি, তাহাতে কি দেখা যায়? জ্ঞানপ্রেম ইচ্ছাসমন্বিত একটি ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। জানিতেছে, ভাল বাসি-

তেছে, ইচ্ছা করিতেছে এমন একটি পদার্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। উহা সাকার নয়, নিরাকার। যদি বল আমি তুমি শরীর, ইহা তোমার অত্যন্ত ভুল। মৃত্যুর পর আত্মা চলিয়া যায়, দেহ থাকে, সেই দেহকে কে রাম বা শ্যাম এইরূপ জীবাত্মার বিশেষ নামে সম্বোধন করিয়া থাকে বা আদর করে? একটি শিশুও স্পষ্ট বুঝিতে পারে দেহ প্রাণশূন্য হইয়াছে, প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আত্মদর্শন বাহ্য দৃষ্টিতে হয় না, জ্ঞাননেত্রে হইয়া থাকে। বাহিরের স্থূল চক্ষু স্থূল ভৌতিক বস্তুমাত্র কথঞ্চিৎ দর্শন করে, অন্তশ্চক্ষু জ্ঞাননেত্র জ্ঞানপদার্থকে অবধারণ করিয়া থাকে।

এইরূপে জ্ঞাননেত্রে বা বিশ্বাসনেত্রে ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্ম নিরাকার চিন্ময় অনন্ত। ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে ঋষি বচন এই ;—

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

ঈশোপনিষদ্।

অর্থ ;—তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

"অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতোঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।"

কঠোপনিষদ।

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন ; বিগত শোক ব্যক্তি সেই

ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতাকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করেন।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" তথা রসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতো পরং ধ্রুবং নিচার্য্য তন্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে।"

কঠোপনিষদ্।

যাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, নিত্য ও নির্ব্বিকার, জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়।

"অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ।

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি দূরগামী; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন; এবং তাহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন।

হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র মহামান্য প্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থে উক্ত এই সকল মহর্ষি বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার নিরবয়ব ইন্দ্রিয়াদিবর্হিত ও মহান্ অনন্ত। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী, তিনি হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহাকে দর্শন করা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—

"যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা, ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

ধীর ব্যক্তি কালত্রয়ের প্রভু প্রকাশবান্ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন। তখন আর তিনি কাহারও নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না।

কি প্রকারে জীবাত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করে, কঠোপনিষদে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

"হৃদা মনীষা মনসোভিক্লিপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুংশক্যো ন চক্ষুসা, অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে।"

ইনি হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন। এইরূপে যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি আছেন এই কথা যে বলে তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন? অপিচ মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"নচক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন ; তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া জ্ঞান প্রসাদে নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

পরম ধার্ম্মিক মহাজ্ঞানী পূজ্যপাদ যোগী ঋষিগণ এক বাক্যে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার নিরবয়ব, তাঁহাকে দর্শন করা যায়। এই বাহ্য নেত্রে তাঁহাকে দেখা যায় না, বিশুদ্ধ জ্ঞানে অর্থাৎ বিশ্বাসের আলোকে তিনি প্রকাশিত হন। তিন আছেন, এইরূপ যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই অন্তরে পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রাতঃ, তুমি বলিতেছ, আমিত ঈশ্বরকে কিছুতেই দেখিতে পাইতেছি না। তুমি দেখিতে পাই-

তেছ না বলিয়া ঈশ্বর দর্শন হয় না, এ কথা বলিতে পার না। তোমার অন্তদৃ‍‌ষ্টি মোহজালে আচ্ছন্ন। সেই মায়া মোহরূপ জালি ছেদন করিয়া উন্মোচন কর, সাধন ভজন ও প্রার্থনারূপ অঞ্জন দ্বারা নেত্রকে নির্ম্মল কর, ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে দর্শন করিতে পারিবে। জন্মান্ধ যদি বলে সূর্য্যোদয় হয় না, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিবে, তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ, তোমার চক্ষুর দোষ, সূর্য্য প্রতিদিন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। আমি সম্মুখস্থ আলোক বা বৃক্ষ দেখিতেছি, শর্করার মিষ্টতা উপলব্ধি করিতেছি, ইহা আমি তোমাকে যুক্তি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে বুঝাইয়া উঠিতে পারি না, আমার চক্ষু ও আমার রসনা তাহার প্রমাণ, অন্য প্রমাণ নাই। এরূপ নিজে ব্রহ্মকে দর্শন না করিলে অপর কেহ বুঝাইতে গেলে বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, অন্ধ পিতাকে তাহার বালকের দুগ্ধ বুঝাইবার ন্যায় ফল হয়। যথা, একজন জন্মান্ধ স্বীয় চক্ষুষ্মান্ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, দুধ কিরূপ? পুত্র বলে, দুধ সাদা। পিতা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করে, সাদা কি রকম? পুত্র উত্তর দান করেন, পিতঃ, সাদা বক দেখ নাই? দুধ সেই বকের মত। অন্ধ বলে, বাবা, বক কেমন করিয়া দেখিব? বক কি রকম? বালক বলিল, বক কাস্তের মত, তার বাঁকা গলা। অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল, কাস্তে কি রকম? পুত্র তখন একখানা কাস্তে পিতার হস্তে প্রদান করে। সেই কাস্তে-খানায় হস্তামর্শন করিয়া অন্ধ বলিল,' বাছা, এতদিনে দুধ কি তাহা বুঝিলাম। ভাই, তোমাকে ব্রহ্মরূপ বুঝাইতে গেলে সেই অন্ধের দুগ্ধ দর্শনের ব্যাপার ঘটিবে। তুমি সাধন ভজন করিয়া অন্তশ্চক্ষু বিশ্বাসনেত্রকে পরিষ্কার কর, ব্রহ্ম তোমার অন্তরে

প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিচার দ্বারা তুমি তাঁহাকে কখন দর্শন বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধযা ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বৃণুতে তনুং স্বাম্।"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা কিংবা বহু শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন সেই সাধকের নিকটে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

এই ঋষি বাক্য অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ,তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে অন্য উপায়ে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। যেমন সূর্য্যকে সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে বাহ্য নেত্রে লোকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মজ্যোতিতে দিব্যচক্ষুতে দর্শন করে। সাধকের উপযুক্ত অবস্থা হইলেই ব্রহ্ম তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হন। যদি তুমি বল অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মনুষ্য কেমন করিয়া দর্শন করিবে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে তিনি কিরূপে প্রকাশিত হইবেন? এ যে অসম্ভব। হাঁ ক্ষুদ্র মনুষ্য ব্রহ্মের অনন্ত রূপ গুণ অনন্ত শক্তি মহিমা একেবারে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্রতানুরূপ কিছু কিছু দর্শন করিতে পারে। মনে কর বড় জালার ন্যায় একটী প্রকাণ্ড রসগোল্লা আছে, একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা সেই রসগোল্লা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত, অধিক হইলে সেই রসগোল্লার লক্ষাংশের একাংশ সেই পিপীলিকার মুখে ও উদরে স্থান পায়। তথাপি

পিপীড়াটী রসগোল্লা খাইতেছে, এবং তাহার মিষ্টতা সম্ভোগ করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মের অনন্ত রূপ গুণের কিঞ্চিন্মাত্র দর্শন ও ধারণ করিতে পারেন,তাহাতেই তিনি একেবারে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। সেই নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনন্তরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেমের রূপ পুণ্যের রূপ ইত্যাদি। সাধককে তিনি নব নব রূপ প্রদর্শন করেন, তাঁহার নিকটে নব নব ভাবে প্রকাশিত হন। কখন পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে, কখন কখন জ্ঞানদাতা গুরুরূপে, কখন রাজা বা প্রভুরূপে দর্শন দেন। সমুদায় রূপই জড়নেত্রের অবিষয়ীভূত নিরাকার। যে সাধকের যে ভাব প্রবল, তিনি ব্রহ্মের সেই ভাবের রূপ উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যাঁহার জ্ঞানপ্রধান জীবন তিনি জ্ঞানময় গুরুরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। যাঁহার প্রেমপ্রধান জীবন তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম সুকোমল মাতৃরূপে প্রকাশিত হন। যেমন একটি পাত্রে জল ও তৈল আছে, যদি তুমি এক খণ্ড বস্ত্রের কিঞ্চিদংশ তৈলসংযুক্ত করিয়া সেই তৈলমিশ্রিত জলে স্থাপন কর, উক্ত তৈলাক্ত বস্ত্র জল আকর্ষণ না করিয়া তৈলকে অগ্রে আকর্ষণ করিয়া লইবে। অপিচ যদি তাহা জলসংযুক্ত করিয়া ধারণ কর, তৈল আকর্ষণ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে জল আকর্ষণ করিবে। দুই সজাতি পদার্থ পরস্পরকে আপনার অভিমুখে টানিয়া লয়। এই রূপ সাধকের ক্ষুদ্রজ্ঞান ব্রহ্মের মহা জ্ঞানকে আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্র প্রেম প্রেমসাগরকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। সাধক প্রথমেই যে ব্রহ্মকে সমুজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে পারেন তাহা নহে। প্রথমতঃ দূরস্থ বস্তুর দর্শনের ন্যায় অনুজ্জ্বল অস্পষ্ট দর্শন করেন,

প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিচার দ্বারা তুমি তাঁহাকে কখন দর্শন বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তমেবৈষ বৃণুতে তনুং স্বাম্।"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা কিংবা বহু শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন সেই সাধকের নিকটে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

এই ঋষি বাক্য অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ,তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে অন্য উপায়ে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। যেমন সূর্য্যকে সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে বাহ্য নেত্রে লোকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মজ্যোতিতে দিব্যচক্ষুতে দর্শন করে। সাধকের উপযুক্ত অবস্থা হইলেই ব্রহ্ম তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হন। যদি তুমি বল অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মনুষ্য কেমন করিয়া দর্শন করিবে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে তিনি কিরূপে প্রকাশিত হইবেন? এ যে অসম্ভব। হাঁ ক্ষুদ্র মনুষ্য ব্রহ্মের অনন্ত রূপ গুণ অনন্ত শক্তি মহিমা একেবারে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্রতানুরূপ কিছু কিছু দর্শন করিতে পারে। মনে কর বড় জালার ন্যায় একটী প্রকাণ্ড রসগোল্লা আছে, একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা সেই রসগোল্লা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত, অধিক হইলে সেই রসগোল্লার লক্ষাংশের একাংশ সেই পিপীলিকার মুখে ও উদরে স্থান পায়। তথাপি

পিপীড়াটী রসগোল্লা খাইতেছে, এবং তাহার মিষ্টতা সম্ভোগ করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মের অনন্ত রূপ গুণের কিঞ্চিন্মাত্র দর্শন ও ধারণ করিতে পারেন, তাহাতেই তিনি একেবারে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। সেই নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনন্তরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেমের রূপ পুণ্যের রূপ ইত্যাদি। সাধককে তিনি নব নব রূপ প্রদর্শন করেন, তাঁহার নিকটে নব নব ভাবে প্রকাশিত হন। কখন পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে, কখন কখন জ্ঞানদাতা গুরুরূপে, কখন রাজা বা প্রভুরূপে দর্শন দেন। সমুদায় রূপই জড়নেত্রের অবিষয়ীভূত নিরাকার। যে সাধকের যে ভাব প্রবল, তিনি ব্রহ্মের সেই ভাবের রূপ উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যাঁহার জ্ঞানপ্রধান জীবন তিনি জ্ঞানময় গুরুরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। যাঁহার প্রেমপ্রধান জীবন তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম সুকোমল মাতৃরূপে প্রকাশিত হন। যেমন একটি পাত্রে জল ও তৈল আছে, যদি তুমি এক খণ্ড বস্ত্রের কিঞ্চিদংশ তৈলসংযুক্ত করিয়া সেই তৈলমিশ্রিত জলে স্থাপন কর, উক্ত তৈলাক্ত বস্ত্র জল আকর্ষণ না করিয়া তৈলকে অগ্রে আকর্ষণ করিয়া লইবে। অপিচ যদি তাহা জলসংযুক্ত করিয়া ধারণ কর, তৈল আকর্ষণ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে জল আকর্ষণ করিবে। দুই সজাতি পদার্থ পরস্পরকে আপনার অভিমুখে টানিয়া লয়। এই রূপ সাধকের ক্ষুদ্রজ্ঞান ব্রহ্মের মহা জ্ঞানকে আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্র প্রেম প্রেমসাগরকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। সাধক প্রথমেই যে ব্রহ্মকে সমুজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে পারেন তাহা নহে। প্রথমতঃ দূরস্থ বস্তুর দর্শনের ন্যায় অনুজ্জ্বল অস্পষ্ট দর্শন করেন,

ক্রমে যত তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন, এবং তাঁহার দিব্যচক্ষু সতেজ হয়, তত তিনি উজ্জ্বল ও নিকটে ব্রহ্মকে দর্শন করেন। "প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতে বিভাতি' তখন সাধক সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত দেখেন। জগতের সমুদায় ক্রিয়া ও শক্তির মূলে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার জ্ঞান কৌশল স্নেহ প্রেম দর্শন করিয়া সাধক মুগ্ধ ও পুলকিত হন। আবার তিনি চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক অন্তরে "প্রাণস্য প্রাণঃ" রূপে দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। পরে অন্তর বাহির তিনি তন্ময় দেখেন। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করেন না। কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলেও সেই দীনবন্ধু পতিতপাবন তাহাকে দর্শন দান করেন। এইরূপ দর্শনে নবজীবন লাভ ও পরিত্রাণ হয়। নববিধান বলেন, ব্রহ্মপূজায় ব্রহ্মদর্শন না হইলে সে পূজা নিষ্ফলা। ঈশ্বরকে ডাকিলাম, তাঁহার জন্য আর্ত্তনাদ করিলাম, তিনি দর্শন দিলেন না, তাঁহাকে এরূপ ডাকিয়া ফল কি? আদি সাধক বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্য চন্দ্র অনল বরুণাদি বাহ্য পদার্থে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তেজ ও শক্তিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন পূর্ব্বক স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি করিয়াছেন। প্রায় তিন সহস্র বৎসর হইল পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুসাদেব প্রান্তরে জ্বলন্ত অগ্নিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং দর্শনের জন্য তাঁহাদের কোনরূপ সাধন ভজনও নাই। তাঁহারা ঈশ্বরদর্শন ছাড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক স্বর্গগত মহাপুরুষে সম্বদ্ধ হইয়া আছেন। বড় দুঃখের বিষয়।

ঈশ্বর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, তিনি কখন সৃষ্টবস্তু সাকার হইতে পারেন না। সাকার হইলে তাঁহার অনন্তত্ব ও সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব খণ্ডিত হয়, তিনি পরিমিত সৃষ্ট বস্তু হইয়া পড়েন। ঈশ্বরের অনন্তত্ব না থাকিলে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না। অনন্ত মহান্ পরম সুন্দর ঈশ্বরের তুলনার যোগ্য কোন সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারে না। যদি তুমি প্রস্তর বা মৃত্তিকাযোগে কোনরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া "এই ঈশ্বরের রূপ" বলিয়া প্রদর্শন কর, তাহাতে ভয়ানক ঈশ্বরাবমাননা হয়। উহা অত্যন্ত পাপ। কেহ যদি একটী বিকৃত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বা কুৎসিত সং সাজাইয়া বাহির করে, এবং বলে ইহা অমুকের মাতা বা পিতার রূপ, তাহাতে সেই ব্যক্তি স্বীয় মাতার বা পিতার অবমাননা ভাবিয়া মনে কত কষ্ট অনুভব করেন, সমর্থ হইলে সেই মুর্ত্তি তিনি তখনই ভাঙ্গিয়া ফেলেন, অথবা নির্ম্মাতাকে ও সংএর প্রবর্ত্তককে শাস্তিদানের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। এজন্যই ঈশ্বর-ভক্ত মহাপুরুষ এব্রাহিম ও মোহম্মদ ঈশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের সাধারণ ও বিশেষ করুণা।

অনেক লোক ঈশ্বরের সাধারণ করুণা স্বীকার করেন, কাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা হয় তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে অসম্মত; আবার অনেক লোক নরনারীর দুঃখ বিপদ্ দর্শন করিয়া তাঁহাকে করুণাময় পূর্ণমঙ্গল বলিতে কুণ্ঠিত। এই গুরুতর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

ঈশ্বরের সাধারণ করুণা অস্বীকার করে এমন লোক বিরল। বিশেষ করুণা স্বীকারে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকের আপত্তি দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর বিশেষ করুণা প্রকাশ করিলে তিনি পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত হন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান করুণা সমান স্নেহ; তিনি কাহাকে অধিক কাহাকে অল্প ভাল বাসেন, এ হইতে পারে না। তাঁহার উদার প্রেম প্রত্যেক নরনারীর প্রতি সমান, উহার তারতম্য নাই। আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না, তিনি ধনী দরিদ্র বিদ্বান্ মূর্খ সকলকে সমান ভাল বাসেন, কেহ তাঁহার অত্যধিক প্রিয়, কেহ প্রিয় নয়, এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহার সমান করুণাসত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন লোকে অবস্থাভেদে তাহা সাধারণ বা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে। মনে কর শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহা সাধারণ ভাবে সম্ভোগ করিতেছে; কিন্তু এক জন আতপতাপিত পথ-শ্রান্ত ব্যক্তি সেই সমীরণ সংস্পর্শে বিশেষ সুখ অনুভব করিল, তাহার সমুদায় গাত্রদাহ ও শ্রান্তির নিবৃত্তি হইল, বাঁচিলাম বলিয়া সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিল, এই সমীরণ অপর সকল লোকের পক্ষে সাধারণ করুণা, এবং সেই পথশ্রান্ত সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ করুণা হইল। কেন না সে ব্যক্তি তাহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিল। এরূপ অপরাপর লোকেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাধারণ সমীরণকে বিশেষ করুণারূপে প্রাপ্ত হয়। লোকালয় হইতে বহু দূরে এক অরণ্য ভূমিতে এক-জন লোক কাঠ কাটিতে গিয়াছে, সেখানে সে বিষম জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়, সে চলৎশক্তিহীন শয্যাগত হইয়া পড়ে। তাহার

জন্য ঔষধ পথ্য নাই, তাহার সেবা শুশ্রূষা করে এমন কেহ নাই, সে সেই বিপদে পড়িয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন সময় একজন সুচিকিৎসক সেই অরণ্যের পার্শ্ববর্ত্তিনী নদী দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, তিনি প্রয়োজনবশতঃ নৌকা সংলগ্ন করিয়া কূলে উত্তীর্ণ হন, এবং অরণ্যের ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। হঠাৎ সেই নিঃসহায় মুমূর্ষু রুগ্ন ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তিনি দেখিয়াই দয়াবশতঃ তাহাকে আপন নৌকায় তুলিয়া লন, এবং ঔষধ প্রদান করেন ও তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহাতে অচিরে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। কাননে সেই রুগ্ন কাঠুরের পক্ষে এইরূপ চিকিৎসকের উপস্থিতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। এই প্রকার সাধারণ করুণা কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ অবস্থাতে বিশেষ করুণারূপে প্রকাশিত হয়, ইহা সময়ে সময়ে সকলের সম্বন্ধে ঘটিতে পারে ও ঘটিয়া থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত দোষ হয় না। তিনি অপক্ষপাতী উদার করুণাময়।

অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে, কেহ পরম সুখে রাজ-প্রাসাদে স্থিতি করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে, সৌভাগ্য সম্পদের সূর্য্য নিয়ত তাহার উপর উদিত রহিয়াছে, অনেকে আবার দুর্ভাগ্যের ছিন্ন কন্থায় আচ্ছাদিত হইয়া শাকান্ন ভোজনে তরুমূলে স্থিতি করিতেছে; কেহ পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনাদিতে পরিবৃত হইয়া আনন্দ উল্লাসে মত্ত, কেহ বা পুত্র কন্যাদির বিরহ-শোকে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। ইহাতে তো ঈশ্বরের পক্ষপাত স্পষ্ট প্রতীতি হয়। ইহাতে কতকগুলি লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা বিদ্যমান, কতকগুলি লোকের প্রতি তাঁহার

বিশেষ করুণার প্রকাশ দূরে থাকুক, সাধারণ করুণারও সম্পূর্ণ অভাব। এমন কি বলিতে গেলে তাঁহার নিষ্ঠুরতাই বলা যায়। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহাদের বিষম ভুল। লোকের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। যাঁহারা বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি দেখিয়া সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্তি-জালে জড়িত। পৃথিবীর সম্রাট্ অপেক্ষাও একজন কুটীরবাসী ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সুখী ও ভাগ্যবান্ হইতে পারে। একজন পুত্রকলত্রবিহীন শোকাতুর লোক পুত্র কলত্রবান্ লোক অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন না, ইহা স্বীকার করা যায় না। সৌভাগ্য পুণ্যে দুর্ভাগ্য পাপে, সুখ চিত্তের সন্তোষে দুঃখ অসন্তোষে হইয়া থাকে। এ সমুদায় আভ্যন্তরিক বিষয় হয়, বাহ্যিক নহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে ;—

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ, সন্তোষং পরমং সুখং দুঃখ-মূলং বিপর্য্যয়ঃ।"

অর্থ ;—সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরম সন্তোষকে আশ্রয় করিয়া সংযত হইবে, সন্তোষই পরম সুখ তদ্বিপরীতই দুঃখের মূল।

কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "পুণ্য সমগ্র জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, কিন্তু পাপ যে কোন জাতির পক্ষে তিরস্কার।" বাস্তবিক সুখ সৌভাগ্য জীবনের পবিত্রতা ও অন্তরের সন্তোষের উপর নির্ভর করে। রাজা মহারাজ ধনৈশ্বর্য্যশালী লোকের বিপদ্ পরীক্ষা দুশ্চিন্তার শেষ নাই, সাধারণতঃ তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা অধিক, সুতরাং মনে সন্তোষ নাই, শান্তি নাই। তাঁহারা যেমন পাপ প্রলোভন ও রিপুর দ্বারা সহজে পরিচালিত হন, সামান্য দরিদ্র

ব্যক্তি সেরূপ নহে। ধনী বিলাসী লোক অপেক্ষা সামান্য লোককে সমধিক চরিত্রবান্ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীরেই সুখ শান্তি সৌভাগ্য অধিক বিরাজ করে। একজন দরিদ্র মধ্যাহ্নে ক্ষুধার সময় শাকান্ন ভোজন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিসুখ অনুভব করে, ধনী মিষ্টান্নে, পলান্নে ও পরমান্নে কখন সেরূপ তৃপ্তি পান না। তাহার মুখে উপাদেয় সুমিষ্ট সামগ্রী সকল অনেক সময় বিরস ও তিক্ত বোধ হয়। একজন দরিদ্র ভূতলে সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া সুনিদ্রা সম্ভোগ করে, ধনী সুবর্ণ পল্যঙ্কে পয়ঃফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নানা দুশ্চিন্তায় ছটফট করিয়া অনিদ্রায় নিশা যাপন করেন। অতএব বাহিরের অনুকূল অবস্থায় ও ঐশ্বর্য্যে সুখ সৌভাগ্য নয়, অন্তরের সন্তোষই সুখের কারণ। যাঁহার যত অভাববোধ অল্প, যত ইন্দ্রিয় সংযত, ভগবানে যত অনুরাগ, তিনি তত সুখী ও সৌভাগ্যশালী। এক বাদশার কোন উত্ত-রাধিকারী ছিল না, মৃত্যুকালে তিনি এইরূপ আদেশ করেন যে, কল্য প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে যে ব্যক্তি রাজধানীতে প্রবেশ করিবে তাহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করা হইবে। দৈবাৎ একজন ভিক্ষোপজীবী ফকির নগরে প্রথম প্রবিষ্ট হন। অমাত্যমণ্ডলী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তখ্‌তের উপর স্থাপন করেন। ফকির বাদশা হইয়া কিয়দ্দিন রাজ্য শাসন করিলে পর, প্রবল শত্রু সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। নব নর-পাল ভাবনা চিন্তায় অস্থির, এমন সময় তাঁহার এক পুরাতন বন্ধু ফকির তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাকে রাজসিংহা-সনে আরূঢ় দেখিয়া মহা সন্তোষ প্রকাশ করেন ও ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ দেন। তাহাতে নব নরপতি বলেন, ভাই, আমার জন্য দুঃখ কর, আনন্দের কোন কারণ নাই। আমার বড় দুঃখের ও বিষাদের অবস্থা। পূর্ব্বে একখণ্ড রুটীর চিন্তা ছিল, এক্ষণ পৃথিবীর চিন্তা আমাকে ঘেরিয়াছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। এই বাদশাহী অপেক্ষা ফকিরী সহস্রগুণে ভাল।' অতএব ভ্রাতঃ, বাহ্যিক অবস্থার তারতম্যানুসারে লোকের সুখ দুঃখের তারতম্য হয় না। যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি ঈশ্বরানুগত সংকল্পশীল হইলেই সুখী ও ভাগ্যবান্ হইতে পারেন। অনেক রাজাধিরাজ দারিদ্র্য আকাঙ্ক্ষা করেন। কত রাজা মহারাজ রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিধান করিয়া তপঃসাধনার্থ পরমানন্দে অরণ্যবাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। একজনকে অন্য জন অপেক্ষা অধিক ধন দান করিয়া এবং একজন অপেক্ষা অন্য জনকে অধিক শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিয়া ভগবান্ পক্ষপাতী হন নাই। বিচিত্র-কর্ম্মা ঈশ্বর একরূপ সৃষ্টি করেন না, সকলকে তিনি সমান করেন না, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি। কি উদ্ভিদ্ কি ইতর জন্তু, কি মনুষ্য, সমুদায় শ্রেণীর সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ছোট বড় আছে। বিশাল অশ্বত্থ তরুরও প্রয়োজন, ক্ষুদ্রকায় তৃণেরও আবশ্যক। একটি উৎকৃষ্ট অভরণ প্রস্তুত করিতে কর্ম্মকার স্থূল হাতুড়ী এবং সূচীবৎ সূক্ষ্ম শিল্প যন্ত্র ব্যবহার করে। নানা আকারের শিল্প যন্ত্র না হইলে সেই বস্তুটি সুন্দর প্রস্তুত হইয়া উঠে না। একটি উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ইষ্টক বহনকারী মুটেরও প্রয়োজন, সূক্ষ্মকর্ম্মা রাজমিস্ত্রী ও চিত্রকরেরও প্রয়োজন। এইরূপ এই বিচিত্র জগতের সুখ কল্যাণ ও শোভার জন্য বিচিত্র প্রকৃতি-

সম্পন্ন ও ধনী দরিদ্রাদি বিচিত্র অবস্থাপন্ন নানা লোকের প্রয়োজন। সৃষ্টিসম্বন্ধে বিচিত্রকর্ম্মা বিশ্বস্রষ্টার এই বিধান। নতুবা পৃথিবীর সুখ সৌন্দর্য্য থাকে না। বিচিত্রতাতেই সুখ সৌন্দর্য্য। মানবজাতির মধ্যে মহাপুরুষ মুসা ঈসা মোহম্মদ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ন প্রভৃতি ও মহাকবি কালিদাস, সেক্সপিয়ার এবং সাদী, ফেরদোসী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের মত লোকও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্মিয়াছে। এই মহৎ ক্ষুদ্র সকল লোকই ঈশ্বরের সাধারণ ও বিশেষ করুণার অধিকারী। তুমি আমি ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই ঈসা মুসা আলেক্জাণ্ডার কালিদাস প্রভৃতি হইতে পারি না। বড় লোকের জীবনের বড় দায়িত্ব, বড় পরীক্ষা বিপদ্, ছোট লোকের ছোট দায়িত্ব ছোট পরীক্ষা। ঈসার জীবনের পরীক্ষা আমি তুমি এক মুহূর্ত্ত বহন করিতে পারি না। ছোট বড় সকলেই সুখসৌভাগ্য ও ঈশ্বরলাভের অধিকারী। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমান করুণা। কেহ ধনী কেহ দরিদ্র হইতেছে ইহা দেখিয়া পুনর্জন্মবাদী হিন্দুগণ বলে যে, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে এরূপ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত ভুল। দুঃখ দারিদ্র্য রোগ সন্তাপ অনেক সময় মহৌষধস্বরূপ হইয়া পাপবিকারগ্রস্ত জীবনকে সংশোধন করে, বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া প্রাণকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। যাহা বন্ধু হইয়া হস্ত ধারণ করিয়া স্বর্গের দিকে লইয়া যায়, তাহাকে কিরূপে দুর্ভাগ্যের কারণ শত্রু বলা যাইবে। বরং, সুখ সম্পদ্ অনেক সময় পাপাসক্ত মোহাচ্ছন্ন ঈশ্বরবিস্মৃত করিয়া জীবাত্মার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। কোন এক যুবা অন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র ছিল।

কথিত আছে, একজন মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদবলে সে মহা ধন-সম্পন্ন হইয়া উঠে। প্রচুর ধন লাভ করিয়াই সে মহা গর্ব্বিত হয়, এবং সুরাপানাদি দুষ্ক্রিয়া করিতে থাকে। সে একদিন বিবাদ কলহ করিয়া একজন লোককে হত্যা করে। পরে রাজ-বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তখন সেই মহা-পুরুষ বলেন, দারিদ্র্যাবস্থায় থাকাই তাহার পক্ষে সৌভাগ্য ছিল, পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হওয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

সাময়িক জলপ্লাবন ঝটিকা বজ্রপাত মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দর্শনে স্থূলদর্শী অবিশ্বাসী হীনমতি লোকেরা ঈশ্বরের করুণা ও মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে সংশয় স্থাপন করে। কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত সেই সকল আপাত দুর্ঘটনার মধ্যে দিব্য চক্ষে তাঁহার করুণা ও নিগূঢ় মঙ্গলভাব সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হন। কখন ঈশ্বরের গভীর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলে তিনি স্বীয় জ্ঞানের ত্রুটি স্বীকার করেন, সেই অনন্ত জ্ঞানসাগর মঙ্গলময় মহামহিমান্বিত পরম দেবের করুণা ও মঙ্গলভাবের কোনরূপ ত্রুটি হইতে পারে কল্পনাযও স্থান দিতে পারেন না। দুঃখ মৃত্যু ও সাময়িক প্রাকৃতিক বিপ্লব অমরাত্মার ও বাহ্য জগতের স্থায়ী কল্যাণের জন্য স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বিশ্বাসী ভক্ত রোগ শোককে বন্ধু, দুঃখ বিপদ্‌কে সম্পদ্‌ বলিয়া আলিঙ্গন করেন। সেই অবস্থায় পড়িলে তাঁহারা ঈশ্বরকে অধিকতর নিকটে উপলব্ধি করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য হইল, না সৌভাগ্য হইল, বিপদ্‌ না সম্পদ্‌ হইল?

প্রত্যাদেশতত্ত্ব।

এক্ষণ লোকের এরূপ ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ঈশ্বর আর কথা কহেন না। পূর্ব্বকালে তিনি যোগী ঋষি-দিগের সঙ্গে, ঈসা মুসা মোহম্মদের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন, এক্ষণ আর তিনি কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না, কাহাকেও আদেশ উপদেশ প্রদান করেন না, তাঁহার কথা ও কাজ শেষ হইয়াছে। এখন তিনি মৌনব্রতী হইয়া এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। জরা-জীর্ণ পিতা যেমন সমুদায় কার্য্যের ভার উপযুক্ত সন্তানের প্রতি অর্পণ করিয়া কিরূপে সংসার চলিবে তাহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া একখানা উইল পত্র লিখিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্ত আশ্রয় করেন, বিশ্বপতি পরমেশ্বরও যেন তদ্রূপ উপযুক্ত সন্তা-নের প্রতি বিশ্ব চালাইবার ভার অর্পণ করিয়া বেদ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি এক এক খানা ধর্ম্মগ্রন্থ রূপ বিধি পুস্তক এক এক সম্প্রদায়কে প্রদানপূর্ব্বক বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করি-তেছেন, তাঁহার আর নূতন আদেশ উপদেশ কিছুই নাই, নূতন বলিবার কিছুই নাই। তাঁহার সমুদায় কথা সেই সকল পুস্তকে শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত গ্রন্থের ব্যবস্থামতে সকলকে চিরকাল চলিতে হইবে। কি ভয়ঙ্কর মত! এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলাতে হিন্দু খ্রীষ্টান মোসলমানাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈদৃশ ঘোর অবনতি ও নির্জীবতা উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যাদেশ শুনিবার পথ তাঁহারা রোধ করিয়া বসিয়াছেন। যেখানে নব নব প্রত্যাদেশ নাই, প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত শুষ্ক পুরাতন মত ও বিধি প্রণালীর অনুসরণ সেখানে নূতনত্ব ও

জীবন কোথায় ? জীবনে প্রত্যাদেশ স্বীকার না করাই নরনারীর দুর্দ্দশা ও দুর্গতির কারণ। ঈশ্বর যদি কথা না কহেন, প্রার্থনা করিলে যদি উত্তর প্রদান না করেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা দান না করেন, তবে তিনি মূক পুত্তলিকা, তাঁহা দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন ?

লোকপাল ভগবান্ প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, বা জরাজীর্ণ কর্ম্মাক্ষম হইয়া কার্য্য ভার ও আদেশ উপদেশ দান ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বে যেমন তিনি স্বয়ং জগৎ শাসন ও প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং কল্যাণার্থ নর-নারীকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, এক্ষণও তিনি পূর্ণকর্ম্মক্ষমরূপে জীবিত আছেন, বিশ্ব চালাইতেছেন ও আদেশ উপদেশ করিতে-ছেন, তাহার কিছুই ব্যত্যয় হয় নাই, কখন হইবে না। অনন্ত কাল তাঁহার বিধাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ও প্রত্যাদেশ প্রেরণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তিনি কখন বৃদ্ধ পিতার উইল পত্র করার ন্যায় এক এক খানা পুস্তক লিখিয়া দিয়া সন্তানগণ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই, করিবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে তিনি কথা কহেন, প্রত্যেককে তিনি উপদেশ দান করেন। শ্রীহরি রসনার সাহায্যে শব্দোচ্চারণ করিয়া কথা কহেন না। তাঁহার বাণী বর্ণাত্মিকা নহে, তাঁহার অশব্দ বাণী, উহা লোকের অন্ত-রেতে ভাবরূপে উপস্থিত হয়, অবস্থার ভিতর দিয়া ঘটনার ভিতর দিয়া সন্তানের নিকটে তাঁহার আদেশ সমাগত হইয়া থাকে।

এই ব্রহ্মবাণীই যথার্থ শাস্ত্র, জীবন্ত বেদ। বিবেকরূপ কর্ণে তাহা শ্রুত হয়, বাহ্য কর্ণে নয়। ব্রহ্মের কথার বিরাম নাই, তিনি নিরন্তর উচ্চ ধ্বনিতে কথা কহিতেছেন। যাহারা একান্ত

অন্যমনস্ক, সংসারের কোলাহলে যাহাদের কর্ণ বধির হইয়া রহিয়াছে, তাহারা সেই ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায় না। কোন লোক কোন গভীর চিন্তাতে নিমগ্ন অথবা কোলাহলপূর্ণ জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেও সে যেমন তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায় না, সাংসারিক চিন্তায় ও সংসারের হট্টগোলে পড়িয়া মানুষ তদ্রূপ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতে অপারগ হয়। তথাপি এক একবার তাহাদের অন্তরে সেই ধ্বনি বেগে আঘাত করে, তাহাদের নিদ্রিত মনকে জাগাইয়া তোলে।

ভ্রাতঃ, কিঞ্চিৎ অবহিতচিত্ত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমা ছাড়া একজন তোমার অন্তরে থাকিয়া নিয়ত কথা কহিতেছেন। তুমি যদি বাম দিকে যাইতে চাও, তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতে বলেন। তুমি লোভে পড়িয়া পরস্বাপহরণে উদ্যত হইলে বা কুসঙ্গে পড়িয়া সুরা পান করিতে ইচ্ছুক হইলে, তৎক্ষণাৎ তুমি অন্তরে নিষেধ শুনিতে পাইবে। কে যেন নিবারণ করেন যে, ইহা করিও না, ইহা পাপ। তুমি ইচ্ছা করিলে এক প্রকার, আর এক জন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহা তোমার কথা নয়, স্বতন্ত্র এক জনের কথা, ইহাকেই বিবেক বা ঈশ্বরবাণী বলে। সাংসারিক হিতাহিত ব্যাপারে নীতিসম্বন্ধে ভগবান্ যে নিষেধ বিধি করেন, সেই ভগবদ্বাণীকে বিবেক বলে, উচ্চ স্বর্গীয় ব্যাপারে, যথা সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন কর, যোগ সাধন কর, অমুক স্থানে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার কর ইত্যাদি বিষয়ে অন্তরে ভগবানের যে নিষেধ বিধি হয় তাহাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া থাকে।

এমেরিকানিবাসী কৃষকনন্দন পঞ্চম বর্ষীয় থিয়োডোর পার্কার ক্ষুদ্র যষ্টিহস্তে কৃষিক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় পথে একটি জলাশয়ের কূলে ভেক দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি এই ধ্বনি স্পষ্টরূপে শ্রবণ করেন, মেরো না, অন্যায়। ইহা শুনিয়া শিশু পার্কার চমকিত হইয়া যষ্টি সম্বরণ করেন। বাড়ীতে যাইয়া মাকে বলেন, "মা, আমি একটি ভেককে লাঠীর আঘাত করিতে চাহিয়াছিলাম, কে যেন বলিয়া উঠিল, একাজ অন্যায়, আমি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মা, যে আমাকে এরূপ বলিয়া নিবারণ করিল সে কে গা?" পার্কারজননী বড়ই ধর্ম্মপরায়ণা ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি শিশুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ভাবে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে কবিলেন, এবং গলদশ্রু নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা, লোকে বলে উহা বিবেক, আমি বলি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাণী। তুমি অন্তরে এই বাণী শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চলিলে দেবত্ব লাভ করিবে।" জননীর মুখে শিশু পার্কার এই কথা শ্রবণ করিয়া অবধি অন্তরে ঈশ্বর-বাণী শ্রবণে সকল কার্য্য করা জীবনের ব্রত করিলেন। তাহাতে তিনি পবিত্রাত্মা সাধু হইয়া পৃথিবীতে মহাব্যাপার সকল সাধন করিলেন। ঈশ্বরবাণী অন্তরে হয়, অনেকে হঠাৎ বুঝিতে পারে না। বাহিরে আকাশে দৈববাণী হইল এরূপ মনে করে। অনেকে বিহ্বল হইয়া ভাবিতে ভাবিতে আকাশে যেন কোন মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কোন অনুগ্রহ হইলে অবোধ শিশু যেমন কোথায় কি হইতেছে তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারে না, তদ্রূপ অনেক লোক অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রহ্মবাণী ঠিক বুঝিতে পারে না।

সকলদেশে পূর্ব্বতন ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষেরা স্বপ্নে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বপ্নযোগে প্রত্যাদেশ হয় এ বিষয়ে তাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস ছিল। তুরস্ক দেশের আদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এব্রাহিম স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তান বলিদানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, আররা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ প্রথমতঃ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

প্রায় কোন ধর্ম্মগ্রন্থকে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য বিশুদ্ধ বলিয়া উঠা যায় না। স্বর্গীয় ভাবকে—প্রত্যাদেশকে বাক্যের পরিচ্ছদ পরাইতে যাইয়া অনেকে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করিয়া তোলেন। যেমন আকাশ হইতে নির্ম্মল বারি বর্ষিত হয়, কিন্তু ভূতলে সেই জল পড়িয়া ধূলি আবর্জ্জনার মিশ্রণে কলুষিত হইয়া প্রণালী দ্বারা নির্গত হয়, তদ্রূপ স্বর্গীয় বাণী মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া মানবীয় ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সময় বিকৃত হয়, এবং রসনাযোগে তাহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণীপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া উঠা যায় না। ধর্ম্মগ্রন্থরচয়িতা ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের ব্যক্তিগত ত্রুটি সকল স্থানে না হউক, কোন কোন স্থলে ঘটিয়াছে, লিপিকরদিগের অসাবধানতাদোষে তাঁহাদের নিজের ভাব ও রুচি ও সাময়িক কুসংস্কার ঈশ্বরবাণীর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া অনেক স্থলেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। অতএব সাবধানে ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যাদেশ বাণী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের আলোক ভিন্ন প্রত্যাদেশ বিষদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে ভ্রমবশতঃ স্বীয় ভাব ও রুচিকে ঈশ্বরবাণী বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পান।

"তস্যৈতস্য মহতো ভুতস্য নিঃশ্বসিতমিদং সাম ঋগ্ যজুঃ।" উপনিষদ।

সে এই মহাভূত ঈশ্বরের নিশ্বসিত এই সাম ঋক্ ও যজুঃ।

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" ভাগবত।

যিনি আদি কবিকে হৃদয়যোগে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বেদের প্রত্যাদেশ অন্তরে হইয়াছিল, বাহিরে নয়, পরে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এরূপ কোরাণে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, স্বর্গীয় দূত জেব্রিল—পবিত্রাত্মা বা প্রত্যাদেশ হজরত মোহম্মদের অন্তরে কোরাণ অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি অনন্ত, তাঁহার বাণীও অনন্ত, উহার শেষ নাই। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে যে, "পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহা যদি লেখনী হয় ও সাগর মসী হয়, তৎপর অন্য সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরের বাণী সমাপ্ত হইবে না।" এই কোরাণের বচন দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরাণে প্রত্যাদেশ সমাপ্ত হয় নাই। মহাপুরুষ মুসা অনুক্ষণ ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কার্য্য করিতেন। যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হইত, তখনই তিনি প্রত্যাদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেন, এবং কাতর প্রাণে প্রত্যাদেশ প্রার্থনায় রত হইতেন।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ভগবানের বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় ও আদেশ সম্পাদনের জন্য দায়ী, এরূপ স্পষ্ট বুঝা যায়। বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের প্রকৃতি, স্বাভাবিক রুচি ও শক্তি ইহার সাক্ষ্য দান করে। তাঁহারা যদি তদ্বিরুদ্ধে চলেন, তবে তাঁহাদের জীবনের ঘোর অবনতি ও দুর্গতি হয়। শৈশবকাল হইতে মহাপুরুষ এব্রাহিম ও মোহম্মদ পৌত্তলিকতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদের জীবন পর্য্যালোচনা

করিলে দেখা যায় যে, একেশ্বরবাদ প্রচারারম্ভ করার বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি তদ্বিষয়ে অস্পষ্টরূপে প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইতেন। পরে হেরা পর্ব্বতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য উজ্জ্বল প্রত্যাদেশালোক প্রাপ্ত হন। তখন হইতে অকুতোভয়ে তিনি প্রচারারম্ভ করেন, পর্ব্বত সমান বাধা বিঘ্নও তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে নাই। এরূপ কেহ কেহ জীবনে শিল্প সাহিত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সহজে সেই সেই বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করেন।

ভগবানের আজ্ঞানুগত ব্যক্তি ফলাফলবাদী নহেন, প্রত্যাদেশানুসারে চলিলে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তিনি তাহার বিচার করেন না। বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসী লোকেরা ফলাফল বিচার কবিয়া থাকে। প্রত্যাদিষ্ট মহাজন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় নির্ব্বিবাদে বিনীত অন্তরে প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। তাহাতে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, প্রভু জানেন, তজ্জন্য প্রভু দায়ী হন, আমি নহি, আজ্ঞা পালন করা মাত্র আমাব কার্য্য, প্রত্যাদিষ্ট মহাজনদিগেব এই উক্তি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগেব কোন কোন প্রত্যাদেশ পালনে সংসারে মহা ঝড় মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়, ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। তাহা দেখিয়া সংশয়ী অবিশ্বাসী লোকেরা চীৎকার করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে, সমুদায় গেল গেল, ইহা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বাসী প্রত্যাদিষ্ট স্থির প্রশান্ত ভাবে স্বর্গের দিকে তাকাইয়া থাকেন। প্রত্যাদেশের ঝড় পৃথিবীকে কাঁপাইয়া অসত্য, অনীতি এবং জীর্ণ পুরাতন মৃতভাব সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নূতন সত্য ও

শান্তির ভূমি পরিষ্কার করিয়া দেয়। অচিরে সকল সংশয় মেঘ কাটিয়া যায়, সত্যসূর্য্য নব বেশে প্রকাশিত হয়। যুগে যুগে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যাদিষ্ট মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, স্বর্গ-রাজ্য আসিতেছে। আবার ইহাও বলিয়াছিলেন, ভ্রাতা ভ্রাতার বিরোধী হইবে, পিতা পুত্র পরস্পর শত্রুতা করিবে, গৃহ অট্টা-লিকা সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে। হজরত মোহম্মদের জীবনে প্রত্যাদেশের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে মক্কা নগরে এমন কি সমগ্র আরব দেশে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া ছিল। মুসা দেবের প্রতি অব-তীর্ণ প্রত্যাদেশের প্রভাবে মেসর দেশ কম্পিত হইয়াছিল। কোন মহাপুরুষের ভিতর দিয়া যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়া পরিত্রাণপ্রদ নূতন বিধান স্থাপন করে, তাহা সংসারের মুখাপেক্ষা করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অবতীর্ণ হয় না, প্রবল ঝটিকার ন্যায় আসিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে—কর্ত্তব্য পালনে ও নীতিবিষয়ে সকল দেশে সকল লোকের প্রতি ঈশ্বরাজ্ঞা একরূপ হইয়া থাকে। যথা চুরি করিও না, নিষ্ঠুর হইও না, পরোপকার কর ইত্যাদি। এ সকল নিত্য অনুজ্ঞা হয়, সাময়িক নয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাময়িক প্রত্যাদেশও হয়। সেই সময় ও অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে উক্ত প্রত্যাদেশের ক্রিয়া আর থাকে না। সামরিক সময়ে যে বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, শান্তির সময়ে সেই বিধি খণ্ডিত হইয়া থাকে। রোগীর আহারের জন্য যে বিধি, সুস্থকায় যুবার নিমিত্ত সেই বিধি নয়। আবার সমাজের ও মণ্ডলীর হিতের জন্য সামাজিক প্রত্যাদেশ হয়, এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। আমার

প্রতি যে বিশেষ প্রত্যাদেশ হইবে, হয়তো তাহা তোমার প্রতি হইবে না। তোমার প্রতি অন্যরূপ আদেশ হইবে। যে ভৃত্য রন্ধন করিতে দক্ষ, প্রভু তাহাকে রন্ধন করিতে আদেশ করেন, যে কিঙ্কর বাজারে দ্রব্যজাত ক্রয় করিতে সুনিপুণ তাহাকে বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকেন, পাচককে সেই কাজে নিযুক্ত করেন না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন জীবনের কাজ লইয়া পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছে, সেই বিশেষ কাজের জন্য সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশেষ নিদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি ভগবানের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে তাহা নিয়ত পালন করেন, তাহার নিকটে নিত্য নব নব গূঢ় প্রত্যাদেশ উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি প্রত্যাদেশ পাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করে, সেই অবাধ্যের পক্ষে ক্রমে প্রত্যাদেশ শ্রবণের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণ লোকের প্রতি সাধারণ প্রত্যাদেশ, উন্নত আত্মাতে বিশেষ প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। যে বালক বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতেছে, শিক্ষক কখন তাহাকে ঋগ্বেদের প্রবচন শিক্ষা দেন না, কেন না সে তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত নয়। তিনি তাহাকে বর্ণমালারই উপদেশ দান করেন, ক্রমে ক্রমে যোগ্যতানুসারে উচ্চ উচ্চ বিষয়ের শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। ঈশা মুসা মোহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগের সম্বন্ধে যে সকল মহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে, মাদৃশ অযোগ্য লোকের প্রতি তাহা হয় না। সম্রাট্ সেনাপতিকে যে গুরুতর কার্য্যের আদেশ করেন, সামান্য পদাতিকের প্রতি তাঁহার সেই আদেশ হয় না।

ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। চুরি কর, ব্যভিচার কর, পুণ্যময় পরমেশ্বর কোন সন্তানের প্রতি এরূপ

আদেশ করেন না। অনেক সময় আদেশ বুঝিতে মানুষ গোল পড়েন। অনেকে নিজের বিশেষ বিশেষ রুচি ও ইচ্ছাকে, চির-বদ্ধমূল কুসংস্কারকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া খ্যাপন করেন। এ বিষয়ে বহু উন্নত সাধক ও গোলে পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরাদেশ বর্ণাত্মক শব্দ নহে, উহা অশব্দবাণী, ভাবরূপে হৃদয়ে উপস্থিত হয়। সেই স্বর্গীয় ভাব কথায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া অনেক সাধক স্বীয় মানবীয় ভাব তৎসঙ্গে মিলিত করিয়াছেন। তাহাতে কুসংস্কার ও অসত্য ও ঈশ্বরাদেশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুসংস্কারবিহীন মার্জ্জিত জ্ঞানে উহা সহজে ধরা পড়ে। যে বিষয়ে বহু মার্জ্জিতচিত্ত সাধক এক বাক্যে বলিতেছেন, ইহা ঈশ্বরের আদেশ, সেস্থলে এক জন দুই জনের তদ্বিরুদ্ধ কথা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কোনটি কুসংস্কার ও আমিত্বসম্ভূত ভাব, নিজের ইচ্ছা ও রুচি এবং কোন্‌টি ঈশ্বরের আদেশ অপক্ষপাতিতায় কিঞ্চিৎ অভি-নিবিষ্ট হইলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ঈশ্বর আমার ইচ্ছা ও ভাবের অনুরূপ অদেশ নাও করিতে পারেন, প্রত্যাদেশ ঠিক তাহার বিপরীত হইতে পারে। ভক্তের রুচি ও ইচ্ছানুরূপ প্রভু আজ্ঞা করিতে বাধ্য নহেন। আপনার আমিত্ব ও ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া প্রত্যাদেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি এবং গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরা রজনী, এমন সময় আদেশ হইতে পারে যে, তুমি পাঁচ ক্রোশ পথ অরণ্য পার হইয়া অমুক গ্রামে অন্নহীন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিয়া আইস।

ভ্রাতঃ, প্রত্যাদেশ বজ্রধ্বনিতে হয়। তুমি বলিতে পার না যে, প্রত্যাদেশ বুঝা যায় না, শুনা যায় না। অন্য গোলমালে

কর্ণপাত না করিয়া একটু স্থির হও, ঈশ্বরবাণী স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। মনে কর তুমি কোন কুসংসর্গে পড়িয়া প্রথম সুরা পান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ, তখন ইহা গর্হিত কার্য্য, করিও না, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ হইবে, সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পানে প্রবৃত্ত হইলে,তখন লজ্জারূপে ভগবানের বাণী আসিবে ; না জানি কে দেখে এই ভাবিয়া জড় সড় হইয়া গোপনে পান করিবে। লজ্জাকে অতিক্রম করিয়া চলিলে, পরে ঈশ্বর ভয় দেখাইতে থাকিবেন, গুরুজন বা দেখে তাহা হইলে শাস্তি পাইব ; এইরূপ ভয় হইবে। তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভয়রূপ প্রত্যাদেশকে অতিক্রম করিয়া পানে রত হইলে তোমার অন্তরে আত্মগ্লানি, অশান্তি ও অবসাদ উপস্থিত হইবে, এ সকল ভগবানের ভৎসনা ও তিরস্কার বাক্য। তাহাতেও তুমি সেই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে তিনি অনুতাপানলে তোমাকে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবেন। ক্রোধ করিয়া কাহার প্রতি অত্যাচার করিলে কেন মনে কষ্ট ও অশান্তি উপস্থিত হয় ? অন্যায় করিয়াছ বলিয়া ভগবান্ তিরস্কার করেন। আবার পরোপকার পরসেবা করিলে কেন আত্মপ্রসাদ হয় ? সেই আত্মপ্রসাদই তোমার প্রতি ভগবানের প্রসন্ন বাক্য। এইরূপ সাময়িক ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ঈশ্বরের উত্তেজনা বাণী, তখন অন্ন জল গ্রহণ করিয়া শরীরের অভাব দূর করিবার জন্য ভগবান্ তোমাকে আদেশ করেন। তাহা না করিলে শাস্তিস্বরূপ শরীর দুর্ব্বল ও ভগ্ন হয়। এইরূপ বিপদ্ সম্পদাদি ঘটনার মধ্যে ভক্ত ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

বৈরাগ্যতত্ত্ব।

"স্বার্থ নাশস্ত্ব বৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে।"

অর্থাৎ স্বার্থনাশই বৈরাগ্য ব্রাহ্মেরা ইহা বলিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যের মূল তত্ত্ব স্বার্থের বিনাশ। আপনার বলিতে যাঁহার কিছুই নাই, নিজের ভোগ সুখের জন্য যিনি কিছুই রক্ষা করেন না, পরসেবার জন্য যাঁহার সর্ব্বস্ব, আপনার শরীর মন আত্মাকে যিনি ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই বৈরাগী। স্থূল কথা সংসারে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগই বৈরাগ্য। কৌপীন পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন, হস্তে কমণ্ডলু ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক লক্ষণে বৈরাগ্য প্রকাশ পায় না। বৈরাগ্য অন্তরে, তাহার বিশেষ বাহ্য প্রকাশ নাও হইতে পারে। রাজ-প্রাসাদে বাস করিয়া ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের মধ্য থাকিয়াও একজন পরম বৈরাগী হইতে পারেন, এবং ছিন্ন কন্থাধারী তরুতলশায়ী ভিক্ষোপজীবী পুরুষও ঘোর সংসারী হয়। অনেক জটাবল্কল-ধারী সন্ন্যাসী পুরুষের অন্তরে বিষয়ানল এরূপ প্রজ্বলিত যে, ঈশ্বরানুরাগ তাহাতে একেবারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সে ভোগামোদ ও ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত, সুযোগ পাইলেই সেই অপবিত্র সুখে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে। অধিকাংশ বাহ্য বৈরাগ্যবেশধারীর অবস্থা এই প্রকার। ছিন্ন কন্থায়, জটাপুঞ্জে বা মুণ্ডিত মস্তকে লোক প্রদর্শনের জন্য তাহার বৈরাগ্য বদ্ধ, অন্তরে বৈরাগ্য নাই। রাজর্ষি জনক অতুল রাজৈশ্বর্য্যের ভিতরে থাকিয়াও বৈরাগী, এস্‌লাম ধর্ম্মের নেতা ওমর রাজাধিরাজ হইয়াও ফকির ছিলেন। কেন না

তাঁহারা ধনে অনাসক্ত ভোগে বীতস্পৃহ, ভগবানের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। আর আমাদের শ্যামদাস বৈরাগী ও কালু ফকির ভোগ সুখের জন্য ধনীর দ্বারে যাইয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া আছেন, সুযোগ পাইলেই অসদুপায়ে ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করেন, প্রলোভন উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। ঈশ্বরে অনুরাগমাত্র নাই, ভজন সাধন যাহা কিছু কেবল লোকের চিত্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য। এই বাহ্য বৈরাগ্য ও কপট বৈবাগ্য নরকের দ্বারের কুঞ্চিকাস্বরূপ। প্রকৃত বৈরাগী আপন বৈরাগ্য গোপন রাখিতে যত্ন করিয়া থাকেন। বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম ভাব বাহিরে যতটা প্রকাশ না পাইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস হয়। পরম বৈরাগী মহর্ষি ঈশা শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "যদি তোমরা উপবাসব্রত পালন কর, তবে মুখে তৈল ম্রক্ষণ করিবে, তাহাতে তোমাদের মুখ সতেজ ও সরস দেখিয়া তোমবা যে, উপবাসব্রতধারী ইহা লোকে বুঝিতে পারিবে না।" যাহারা লোকরঞ্জন ও লোকের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন, বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্নাদি ধারণ করে ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের কোন পুরস্কার নাই, কেন না তাহারা পৃথিবীতে পুরস্কারের প্রত্যাশী হইয়াছে। অবস্থাভেদে বিশেষ সাধনের জন্য সময়ে সময়ে বৈরাগ্যের কোন কোন বাহ্যিক চিহ্ন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। বিষয়ী বিলাসী ভোগাসক্ত লোককে একবার সমুদায় বিলাস দ্রব্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া ছিন্ন কন্থা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান আবশ্যক। তাহা না হইলে তাহার মন বৈরাগ্যের জন্য কখন প্রস্তুত হইতে পারে না। বাহিরের বস্তুর সঙ্গে মন ভাব যোগেতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মাণ

মুক্তার অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ ও মহামূল্য কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করে, রাজপ্রাসাদোপম অট্টালিকায় নানা ভোগ সুখে বাস করে তাহার মনে স্বভাবতঃ ভোগানুরাগ ও বিলাস গর্ব্ব মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, দীনতা ও বৈরাগ্য প্রবেশ করিতে পারে না। যে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করে, বৈরাগ্য সহজে তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে। অতএব বৈরাগ্য সাধনের জন্য দৈন্যবেশ ধারণ আবশ্যক, কিন্তু তাহা যতদূর সম্ভব গুপ্ত রাখিবে। যেমন চকমকি পাথরকে শত বৎসর জলে ডুবাইয়া রাখিলেও তাহার আভ্যন্তরিক অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, তাহাকে তুলিয়া লৌহদণ্ডের আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কিন্তু দীপশলাকা (দিয়াশালাই) একটু ঠাণ্ডা বাতাস পাইলে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলেও আর অগ্নি উদ্গিরণ করে না, তদ্রূপ বৈরাগ্যে সিদ্ধ সাধু পুরুষগণ অতুল বিলাস ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থাকিয়াও খাঁটি থাকেন, কোনরূপ প্রলোভন তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বিকৃত করিতে পারে না, কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িলে অপরিপক্ক লোকের সম্বন্ধে বিষম বিপদের সম্ভাবনা। ভোগবিলাসের শীতল সমীরণসংস্পর্শে তাহার আভ্যন্তরীণ ক্ষীণ বৈরাগ্যানল সহজে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতে পারে। যতদূর সম্ভব চিত্তবিকারের কারণ হইতে তাহার দূরে থাকা আবশ্যক। প্রথম সাধকদিগের পক্ষে কিছু কালের জন্য গৃহত্যাগ সংসার ত্যাগ অরণ্যাশ্রয় প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু চিরজীবনের জন্য কোন সাধনোপায় অবলম্বন বিহিত নয়, তাহা হইলে সেই উপায়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকিতে হয়, লক্ষ্য সিদ্ধির দিকে জীবন অতি অল্পই অগ্রসর হইয়া

থাকে। যে উদ্দেশ্যে যে উপায় অবলম্বন করিব, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সেই উপায়ের সঙ্গে আমার যোগ রাখার আর আবশ্যকতা কি? বর্ণজ্ঞানের জন্য গুরুমহাশয়ের নিকটে বর্ণ-পরিচয় পড়িতে হয়, বর্ণজ্ঞান জন্মিলে কে আর বর্ণপরিচয় পুস্তক পাঠ করে? সংসারে থাকিলে ঈশ্বরে আমার মন স্থির হয় না, বিষয়ে মন আকৃষ্ট ও চঞ্চল হয়, চিত্তচাঞ্চল্যের নিবৃত্তি ও একাগ্রতা সাধনের জন্য নির্জ্জনতা আশ্রয় করিতে পারি। কিন্তু সাধনে চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইলে পর আমাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। আমি চিরজীবন অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়া থাকিব ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি আমাকে সংসারের উপযোগী চিত্তবৃত্তি সকল প্রদান করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, সংসারে থাকিয়া অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিব, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়। সংসারে বাস করিব অথচ তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিব, সংসারে থাকিয়া বৈরাগী হইব। সংসার হইতে—বিষয় প্রলোভন হইতে পলায়ন করিলে জীবনে বৈরাগ্য কোথায় প্রকাশ পাইল? তাহাতে কাপুরুষতারই প্রকাশ। বৈরাগ্য কাপুরুষতা নহে, বীরত্ব। এইরূপ বৈরাগ্যসাধনের জন্য মস্তকমুণ্ডন গৈরিক পরিধান ইত্যাদি সময়ে সময়ে হইতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য নহে। ঈশ্বরের ইঙ্গিত ও অভি-প্রায় বিশেষরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া এ সকল সাধনোপায় গ্রহণ করিতে হইবে, লোককে প্রদর্শন ও আত্মবৈরাগ্য প্রচা-রের জন্য এ সমস্ত হইলে বৈরাগ্যের অবনতি ও দুর্গতি ভিন্ন উন্নতি কখন হইবে না। অতএব এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাব-ধানতা আবশ্যক।

সাধারণতঃ বৈরাগী দ্বিবিধ, বিরক্ত বৈরাগী ও অনুরাগী বৈরাগী। শোক বিপদ্ বা দারিদ্র্য দুঃখের আস্বাদ পাইয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া যে ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহাকে বিরক্ত বৈরাগী বলা যায়। সেই বৈরাগ্যে তাহার মনে সন্তোষ ও শান্তি থাকে না, সে সর্ব্বদা বিরস বিষণ্ণ ও বিরক্ত থাকে, কেন না সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, বাধ্য হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে। সম্পদ্ পাইলে প্রলোভনে পড়িলেই সে পুনর্ব্বার ঘোর বিষয়ী সংসারী হইয়া উঠে। তাহার বৈরাগ্যে কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে জীবনের বিশেষ কল্যাণও হয় না। দ্বিতীয়তঃ অনুরাগী বৈরাগী; ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ হওয়াতে সংসারের প্রতি যাঁহার বিরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে অনুরাগী বৈরাগী বলা যায়। ইনিই শ্রেষ্ঠ বৈরাগী। তিনি দুঃখ ক্লেশের জন্য বিরক্ত হইয়া সংসারের প্রতি বিমুখ হন নাই, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই তাঁহাকে সংসার হইতে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ব্রহ্মসহবাস ও ব্রহ্মদর্শন ভিন্ন তাঁহার মনে অন্য কিছুই ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ তাঁহাকে কষ্ট যন্ত্রণা প্রদান করে, ভাল খাওয়া ভাল পরা যেন তাঁহার অন্তরকে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ করে, তিনি তাহাতে ছটফট করেন। পতি ছাড়িয়া সতীর বসন ভূষণ পরিধান বা পতির অননুমোদিত সুখ ভোগ করা বা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হওয়া যেমন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হয়, প্রকৃত বৈরাগীর পক্ষে ব্রহ্মসহবাস পরিত্যাগ করিয়া বিলাসামোদ ও বিষয়সুখভোগে রত হওয়া ততোধিক কষ্টকর। একদা হজরত মোহম্মদের কোন সহধর্ম্মিণী উৎকৃষ্ট সুকোমল শয্যা তাঁহার জন্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

তিনি তাহাতে শয়ন করিয়া সমুদায় নিশা ছটফট করেন। প্রাতঃ-কালে জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ শয্যা কে আমার জন্য প্রসারণ করিয়াছে? তাহাতে আমার উপাসনার আনন্দে ব্যাঘাত হই-য়াছে। আমার শয়নের জন্য সামান্য স্থূল শয্যা প্রসারিত হইবে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট শয্যা যেন আর কখন স্থাপন করা না হয়। এসলামমণ্ডলীর নেতা ওমর উষ্ট্রারূঢ় হইয়া সামান্য ফকিরের বেশে জেরুজিলাম নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইছিলেন, সেনাপতি আবু ওবয়দা কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া তিনি তখন অত্যুৎ-কৃষ্ট রোমীয় পট্ট বসন পরিধান করেন, এবং উষ্ট্র ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট বণতুরঙ্গমের উপর আরূঢ় হন। ওমর সেই মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মহাতুরঙ্গের উপর আরোহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে নামিয়া পড়েন, এবং পরিচ্ছদ অঙ্গ হইতে উন্মো-চন করিয়া আমার খের্কা লইয়া আইস বলিয়া ডাকিতে থাকেন ও বলেন এ সকল অগ্নির ন্যায় যেন আমাকে দগ্ধ করিতেছে, এই পরিচ্ছদ কণ্টকের ন্যায় যেন আমার শরীরে বিদ্ধ হইতেছে। বাস্তবিক প্রকৃত বৈরাগীদিগের বৈরাগ্যেই আনন্দ, সাং ারিক বিলাস সুখে তাঁহাদের বিষম যাতনা বোধ হয়। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বত্যাগী ভিখারী বৈরাগী হইয়া কি দুঃখী হইযাছিলেন? এক দিনের জন্যও তিনি দুঃখ ও বিরক্তি বোধ করেন নাই, তাঁহার মুখে সর্ব্বদা মধুর হাসি বিরাজিত ছিল, তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন। রাজকুমার শাক্যসিংহ অতুল রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। কে তাঁহার মুখে তজ্জন্য বিষাদের কালিমা দেখিয়াছে? বাল্‌খ দেশের অধিপতি মহাবৈরাগী এব্রাহিম রাজ্যৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জনে বৈরাগ্য ব্রত অব-

লম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি সামান্য বাল্‌খ রাজ্যের বিনিময়ে পরম বৈরাগ্য ধন লাভ করিয়া মহা সৌভাগ্যশালী হইয়াছি। সংসারের নশ্বর অকিঞ্চিৎকর বস্তুর বিনিময়ে যদি অবিনশ্বর সার ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে লাভ না ক্ষতি? ভগ্ন মৃন্ময়পাত্রের বিনিময়ে যদি কেহ হিরণ্ময় পাত্র প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহার লাভ হইল না ক্ষতি হইল? অনিত্য সংসারের পরিবর্ত্তে নিত্য স্বর্গ পাইয়াছি বলিয়া বৈরাগী পুরুষ মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বিষয়াসক্ত বিলাসী সংসারী লোকদিগের অবস্থা ভাবিয়া খেদ করিয়া থাকেন। একদা এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগানুরক্ত বাদশার নিকটে এক পরম ধার্ম্মিক ফকির উপস্থিত হন। বাদশা তাঁহাকে দেখিয়াই সম্বোধন করিয়া বলেন, বৈরাগী পুরুষ, আসন পরিগ্রহ করুন। তাহাতে ফকির বলেন, "আমি বৈরাগী নহি, তুমি বৈরাগী, নিত্য স্বর্গের জন্য আমি অনিত্য অকিঞ্চিৎকর অতি তুচ্ছ সাংসারিক সম্পদে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে আমার বৈরাগ্য কি হইল? তুমি সামান্য অসার অনিত্য বিষয়ের জন্য অমূল্য নিত্য স্বর্গের প্রতি, পরম ধন ভগবানের প্রতি বিরাগী হইয়াছ, তোমারই যথার্থ বৈরাগ্য। আমার সামান্য অনিত্য ধনে বিরাগ, তুচ্ছ বস্তুর জন্য তোমার অমূল্য ধনে বিরাগ, বৈরাগ্যের স্পর্দ্ধা তুমিই করিতে পার।" প্রকৃত বৈরাগ্য তিক্ত কষায় নহে, তাহাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও মিষ্টতা আছে। যাঁহারা তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন তাঁহারা আর তাহা ছাড়িতে পারেন না।

ধর্ম্মের জীবনই বৈরাগ্য, বৈরাগ্যবিহীন যে ধর্ম্ম তাহা মানবীয় মৃত ধর্ম্ম, তাহা সাংসারিকতার রূপান্তরমাত্র। মহর্ষি ঈশা বলিয়া-

ছিলেন, "তোমরা কি আহার করিবে, কি পান করিবে, অথবা কি পরিধান করিবে বলিয়া ভাবিত হইও না, কেন না তোমাদের যে,এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার জন্য ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে।" বৈরাগ্য বিষয়ে ঈশার এই মহোপদেশ পৃথিবী আর কোথায় গ্রহণ করিল? এমন কি ঈশার বর্ত্তমান শিষ্য প্রচারকগণ অগ্রে নিজের অন্ন বস্ত্রের সুব্যবস্থা করেন, ২। ৪ শত টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারণ করেন, পরে প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বিধাতার কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিলে তিনি অন্ন বস্ত্র দিবেন সেই বিশ্বাস কোথায়? তাঁহার প্রতি সেইরূপ নির্ভর কোথায়? প্রচারক বিধাতার মুখাপেক্ষী না হইয়া লোকের মুখাপেক্ষী হন। প্রচারকের শুধু মাহিয়ানার ব্যবস্থায় কি শেষ? কোম্পানির কাগজ, ব্যবসায়ের অংশ, তালুক জমীদারী ক্রয় টাকার সুদ ইত্যাদি উপায়েও অর্থোপার্জ্জন কি তাঁহাদের অনেকের হয় না বলা যাইতে পারে? "অগ্রে স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।" ঈশা কল্যকার আহারের চিন্তা অদ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ ত্রিশ দিনের অর্থাৎ এক মাসের উত্তম ভোজ্য পরিচ্ছদাদির চিন্তা করিয়া পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। একজন বন্ধু গোলাগৃহে সম্বৎসরের আহারের উপযোগী ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদা আচার্য্যদেব তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া সেই গৃহটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, এই গৃহের ভিতরে কি? বন্ধু বলিলেন, ইহার

মধ্যে "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" বস্তু সঞ্চিত আছে। যদি বন্ধু "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" না বলিয়া সম্বৎসরের জন্য চিন্তা করিও না, এমন বস্তু ইহার ভিতরে আছে বলিতেন, ঠিক হইত। একজন বিষয়ী গৃহস্থ পূর্ব্বেই আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন আশ্চর্য্য কি? প্রচারকেরাই এই পরিণামদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যে স্থানে বৈরাগ্য নাই, অন্নদাতা বিধাতার প্রতি নির্ভর ও জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই, সেই স্থানে স্বর্গীয় ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্মের প্রবেশ নাই। মোসলমান তপস্বী ও তপস্বিনীগণ বৈরাগ্যের উচ্চ দৃষ্টান্ত যেমন জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ অন্যত্র বিরল। এ স্থলে তাহার দুই একটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। শাহ সুজানামক একজন মোসলমান তপস্বী ছিলেন। তিনি কেম্মাণদেশাধিপতির বংশসম্ভূত মহাধনীর সন্তান ছিলেন, পরে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণা কন্যা ছিলেন। অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হন, কিন্তু শাহ সুজা সকলকে নিরাশ করিয়া একজন উপাসনাশীল নিঃস্ব বৈরাগী যুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। তিনটি পয়সা ব্যয়ে শুভ উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহান্তে কন্যা স্বামীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, এক প্রান্তে কয়েক খানা রুটী স্থাপিত আছে। নববধূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে এ রুটী কেন? স্বামী উত্তর করেন, ইহা আমাদের আপরাহ্নিক ভোজনের জন্য রাখা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া শাহ সুজাদুহিতার মুখমণ্ডল ঘোর বিষাদের কালিমায় মলিন হইল, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন যে, পিতার

ব্যবহারে 'আমি আশ্চর্য্যান্বিতা, পিতা আমাকে পুনঃ পুনঃ এরূপ আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে নির্ভরশীল বৈরাগী পুরুষের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবেন। হায়! বিশ বৎসর পরম স্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়া পরিশেষে এমন সংসারী পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিলেন যিনি ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিয়া ভোজ্যজাত অগ্রে সঞ্চয় করিয়া রাখেন। আমি এই ঘোর বিষয়ীর ঘরে থাকিব না। বধূর ভাব দেখিয়া ও কথা শ্রবণ করিয়া বরের চক্ষু স্থির। তিনি সভয়ে ও সপ্রতিভ অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে এক্ষণ উপায় কি? নববধূ বলিলেন, হয় রুটী বহির্নিক্ষিপ্ত হইবে, না হয় আমি পিতৃসন্নিধানে চলিয়া যাইব, এ দুইয়ের একতর হইবে। তখন বিবাহিত যুবা আস্তে ব্যস্তে রুটী বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। একদা এক তপস্বীর নিকটে এক যুবা বৈরাগ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আসিয়া ছিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বলেন, "তোমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা আমার নিকটে লইয়া আইস।' যুবা তদনুসারে গৃহ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় সহস্র মুদ্রা আচার্য্যের নিকটে লইয়া আসিলেন। তপস্বী বলিলেন, "যাও এই সমুদায় মুদ্রা এই নদীতে বিসর্জ্জন করিয়া এস।" তখন আজ্ঞানুসারে যুবা নদীকূলে যাইয়া একটি একটি করিয়া সমুদয় টাকা বিসর্জ্জন করিলেন, এবং পরে তপস্বীর নিকটে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তপোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুদ্রা বিসর্জ্জনে তোমার বিলম্ব হইল কেন?" তিনি বলিলেন, "একটি একটি করিয়া জলে ফেলিয়াছি, তাহাতেই বিলম্ব হইল।" তপস্বী বলিলেন, "তুমি একবারের কার্য্য

সহস্রবারে করিয়াছ, টাকার মায়া এক্ষণও তোমার অন্তরকে পরিত্যাগ করে নাই, তুমি উচ্চ বৈরাগ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত হও নাই, আপাততঃ বাজারে যাইয়া মুদ্রাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া মুদ্রা গণনা কর।" একজন মোসলমান তপস্বীর শিষ্যকে এক ধনবান্ পুরুষ ডাকিয়া লইয়া যান, পুঞ্জ পরিমাণে ঘৃত আটা ও নানা প্রকার তরকারি ও মশলা ও ফল ইত্যাদি সেই শিষ্যের যোগে তপস্বীর জন্য পাঠাইয়া দেন। ভোজ্য সমগ্রীর এক মোট শিষ্যের মস্তকে এবং এক এক মোট তিন চারি জন মুটের মস্তকে ছিল। শিষ্য মহা আনন্দে খাদ্যজাত সহ আসিতে ছিলেন। তপস্বী দূর হইতে ইহা দেখিয়া শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে আসিবে না, এ সকল ভোগোপকরণ এক্ষণই দাতাকে ফিরাইয়া দাও, আমি তাহা গ্রহণ করিব না, এবং তুমি বাজারে যাইয়া মুটের কার্য্য কর।" গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সামগ্রী থাকিলে অন্ন বস্ত্রাদির জন্য দান গ্রহণ করা মোহম্মদীয় বৈরাগ্য শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিবে, তদভাবে দান গ্রহণ করিবে, এই বিধি। ভোগ বিলাসের জন্য কিছু গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুগামী ভক্তমণ্ডলী জীবনে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিক্ষালব্ধ চারি পণ কৌড়ীতে গৌরাঙ্গের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, দুই তিন জন ভক্ত আবার তাঁহার প্রসাদ পাইতেন। শ্রীচৈতন্যের ভোজ্যজাত দেখিয়া কেহ উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইনি বৈরাগী হইয়া ধনীর ন্যায় ভোজন করেন। ইহা শ্রবণে তিনি চারি পণ স্থানে দুই পণ কৌড়ী নিজের ভোজ্যজাত

ক্রয়ের জন্য নির্দ্ধারণ. করেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট কষ্ট হইতে থাকে। নববিধান প্রেরিতদিগের প্রতি এইরূপ বিধি যে, তাঁহারা নিজের জন্য ধন স্পর্শ করিবেন না, নিজের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবেন না, সম্পূর্নরূপে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিবেন। তাঁহারা অন্নচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্বার্থত্যাগী বৈরাগী হইয়া প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তে তাঁহারা অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা পরসেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের আপনার বলিতে কিছুই থাকিবে না। অলস হইয়া বসিয়া, প্রচারের জন্য কার্য্য না করিয়া প্রচারার্থে দান কোন প্রচারক ভোগ করিবেন্ না। সেই দান পাইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। দিবসে প্রত্যেকের ৭ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিবার নিয়ম। সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের তিন পয়সায় আহার চলার ব্যবস্থা। তাঁহারা নিজের ভোজন পরিচ্ছদ যান বাহনাদিতে বৈরাগ্যের নিয়ম পালন করিবেন, বিলাসিতা ও শারীরিক সুখের জন্য ব্যয় বাহুল্য করিবেন না।

পরলোকতত্ত্ব।

জীবাত্মা অমর ইহা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, আত্মার অমরত্ব বিষয়ে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক মত। জগতের কোন বস্তুই নশ্বর নহে, একটি পরমাণুরও ধ্বংস নাই। কেবল পরস্পর সংযোগ বিশ্লেষণে তাহার অবস্থান্তর রূপান্তর মাত্র হয়। ঈশ্বর কিছুই বিনাশ করিবার জন্য সৃজন করেন

নাই। স্থষ্ট স্থূল ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ আত্মা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রেম ও দয়া এই কথার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দান করে। আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট। দেহ অচেতন স্থূল ভৌতিক পদার্থ, আত্মা জড়াতীত সূক্ষ্ম চৈতন্য নিরাকার বস্তু। আমি, তুমি, তিনি বলিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মাকে বুঝায়, শরীরকে নয়। আত্মা অবিনাশী,শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছেদকে মৃত্যু বলে। মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ হয় না, এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা স্থানান্তরে তাহার প্রস্থান মাত্র। গৃহ হইতে গৃহী বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন তাহার বিনাশ হয় না, তদ্রূপ দেহচ্যুত হইলে দেহী অর্থাৎ আত্মা অবিনষ্ট থাকে। দেহ আত্মার বাসগৃহস্বরূপ। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মা যে লোকে বাস করে, সাধারণতঃ তাহাকে পরলোক বলে। পরলোক শব্দের অর্থ আত্মার শেষ বাসস্থান বা অন্য ভুবন অথবা শ্রেষ্ঠ জগৎ। হিন্দু শাস্ত্রের মতানুসারে মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মা লোকেরা পরম সুখধাম স্বর্গ লোকে গমন করেন, পাপী লোকেরা নিকৃষ্ট জীব হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। খৃষ্টবাদী ও মোসলমানেরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে কবরে স্থিতি করে। এক সময়ে জগতের প্রলয় ঘটিবে, সেই প্রলয়ান্তে মহা বিচার হইবে, তখন সকল আত্মা সশরীরে সমুত্থান করিবে। সেই সময়ে ঈশ্বর বিচার করিয়া পুণ্যাত্মাদিগকে স্বর্গে এবং পাপীদিগকে নরকলোকে প্রেরণ করিবেন। আমরা এই পুনর্জ্জন্মবাদ ও পুনরুত্থানবাদের বিরোধী ইহা অনৈসর্গিক অসত্য ও ভ্রান্তিপূর্ণ এবং চপল-

প্রকৃতি বালভাষিতের ন্যায় অগভীর ও অসার উক্তি। তদ্রূপ পুনর্জ্জন্ম ও পুনরুত্থান স্বীকার করিলে পরম ন্যায়বান্ প্রেমময় বিধাতার বিচারে দোষ সংস্পর্শ হয়, তাঁহার নির্দ্দয়তা, পক্ষপাতিতা ও অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতি আত্মার একটি গুণ বা ধর্ম্ম, উহা আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করে। আত্মার পুনর্জ্জন্ম হইলে তাহার সঙ্গে স্মৃতিশক্তি থাকিবে, সে পূর্ব্ব জন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে সুক্ষম হইবে, কিন্তু সেরূপ পূর্ব্ব জন্মের কথা কাহারও স্মরণে আছে, কেহ বলিতে পারে এরূপ কখন দেখা যায় না, ইহা অসম্ভব। উন্নতি না অবনতি, পুরস্কার না শাস্তি হইল, স্মৃতি শক্তিতেই লোকে পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া বুঝিয়া লয়, তদনুসারে জীবনকে নিয়মিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর আত্মার একটি প্রধান অঙ্গ স্মৃতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া একজন জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মোন্নত প্রবীণ লোককে তাহার জ্ঞান ধর্ম্মবিনাশপূর্ব্বক অজ্ঞান পশুরূপে পুনর্ব্বার মাতৃগর্ভে স্থাপন করিবেন, তাহার সকল উন্নতি ধ্বংস করিবেন, এরূপ কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহা ন্যায়বান্ দয়াময় ঈশ্বরের কার্য্য নয়, নিষ্ঠুর দৈত্যের কার্য্য। যিনি ন্যায়বর্জ্জিত ও দয়াশূন্য তাঁহাকে ঈশ্বর কেমন করিয়া বলা যায়? তিনি ভয়ঙ্কর দৈত্য। অতএব হিন্দুদিগের পুনর্জ্জন্মবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ অসত্য। খ্রীষ্টান ও মোসলমানদিগের পুনরুত্থানবাদও ভ্রান্তিসঙ্কুল ও কল্পিত। আত্মার দেহচ্যুতিকে মৃত্যু বলা যায়, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মা কবরের ভিতরে দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। লক্ষ বা কোটি বৎসর পর পৃথিবীর প্রলয় ঘটিবে, তখন আত্মা সকল সশরীরে কবর হইতে সমুত্থিত

হইবে। তৎপর ঈশ্বর বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, পাপীকে তাহার পাপের দণ্ডস্বরূপ নরকে, পুণ্যবানকে পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গ লোকে প্রেরণ করিবেন, পাপী নিত্যকাল নরক ভোগ পুণ্যাত্মা নিত্যকাল স্বর্গ ভোগ করিবে। এই পুনরুত্থানবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনৈসর্গিক ব্যাপার, এবং তাহা হইলে ভয়ানক অবিচার হয়। ভগবান্ যাহাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ইহা অনুমোদন করিতে পারেন না। আত্মা দেহচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেহে প্রবিষ্ট, অথচ তাহাতে জীবনের কোন ক্রিয়াই প্রকাশ নাই, যুগ যুগান্তে ভূমিগর্ভে দেহসন্ধি সকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট এবং সমুদায় অস্থি বিচূর্ণ হইয়া গেল, পরে তাহা পুনঃ সংযোজিত ও পূর্ব্ববৎ সুন্দর দেহে পরিণত হইবে, এবং তাহা সমাধি গর্ভ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ব্যাপার। ঈশ্বর বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, তাঁহার সমুদায় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম ও বিধি পূর্ণ, নিত্য ও সার্ব্বভৌমিক এবং অভ্রান্ত। তিনি আজ এক প্রকার নিয়ম করিয়া কাল তাহা ভঙ্গ করেন, স্বয়ং বিজ্ঞানের বিধাতা হইয়া সময়ে সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহাকে এরূপ ভ্রান্ত ও চঞ্চলপ্রকৃতি বলিয়া অবধারণ করা পাপ। লক্ষ বৎসর পর এরূপ পুনরুত্থানের ব্যাপার ঘটিবে, তাহার সত্যতার প্রমাণ কি? ঈশ্বর লক্ষ বা কোটী বৎসর পর পাপীর ও পুণ্যাত্মার দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন এ কিরূপ তাঁহার বিচার? আমার রোগ হইয়াছে ঔষধ প্রয়োগ ও চিকিৎসা লক্ষ বৎসর পরে হইবে, আমার প্রাত্যহিক পারিশ্রমিক না পাইলে দিন চলে না, আমি লক্ষ বৎসর পর তাহা

পাইব, এ কিরূপ অদ্ভুত অবস্থা ? ক্ষুদ্র মনুষ্যের পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরকদণ্ড, ইহা কি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও প্রেমের কার্য্য ? তাঁহার দণ্ড পাপীকে সংশোধন করিয়া সাধু করিবার জন্য, না বিনাশ করিবার জন্য ? ইহা যে মহাবিনাশের কথা। তাহা হইলে তাঁহাকে করুণাময় ঈশ্বর না বলিয়া নির্দ্দয় দৈত্য বলিব। তবে সন্তানের প্রতি পৃথিবীর পিতা মাতার যে টুকু স্নেহ তাহাও তাঁহার নাই বলিব। ঈশ্বর অনন্ত স্নেহময় প্রেমময় পিতা মাতা, মহাপাপীর প্রতিও তাঁহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ এবং নির্য্যাতনস্পৃহা নাই। তিনি প্রতিদিন অন্ন জল ও নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিয়া মহাপাপীর সেবা করিয়া থাকেন, পরে তিনি তাহাকে অনন্তকাল দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারিবেন, ইহা অপেক্ষা উন্মাদের প্রলাপ আর কি হইতে পারে ? বাস্তবিক তাঁহার শাস্তি সাঙ্ঘাতিক বিষ নয়, জীবনপ্রদ মহৌষধস্বরূপ। তিনি মারেন না, তিনি বাঁচান, তিনি স্নেহময়ী মা। পুনর্জ্জন্মবাদ ও পুনরুত্থানবাদ এই দুই মত পরস্পর বিসম্বাদী। হিন্দুরা বলেন যে, আমরা প্রাচীন পরম্পরা পুনর্জ্জন্মের কথা শুনিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের শাস্ত্রেও লেখা আছে, অতএব একথা সত্য। খ্রীষ্টবাদী ও মোহম্মদীয় লোকেরা বলেন, পৃথিবীতে আত্মার আর জন্ম হইবে না, পৃথিবী হইতে এক সময়ে মৃত নরনারীর উত্থান হইবে, এই কথাই সত্য; শাস্ত্রে তাহাই লেখা আছে। আমরা বলি উভয়ই ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পিত।' যাহা অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রাকৃতিক, এবং যে কথা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রেম ও দয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে, তাহা মূলশূন্য।

ভ্রাতঃ, ভাবিয়া দেখ, মৃত্যুর পর দেহের বিচ্ছিন্ন অস্থি সকল

পরস্পর সংযোজিত হইয়া, গলিত ও বিকৃত মাংস পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত ও সজীব হইয়া পুনরুত্থান কালে কবর হইতে বাহির হইবে, যদি এরূপ স্বীকার ও করা যায়, তাহা হইলে যে সকল মৃতদেহ কবরস্থ হয় নাই, সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের উদরে জীর্ণ হইয়াছে, বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কিংবা সাগরে বা নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যাদির উদরস্থ হইয়াছে, সেই সকল দেহের পুনঃ সঙ্গঠন ও কবর হইতে সমুত্থানের কি ব্যবস্থা ? বাস্তবিক এ সকল মনঃকল্পিত অমূলক অপ্রাকৃতিক কাহিনী ভিন্ন নহে।

পরলোকসম্বন্ধে—স্বর্গনরক সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানারূপ বর্ণনা আছে। হিন্দুদিগের স্বর্গ বিচিত্র উদ্যান ও অট্টালিকা সুরা অপ্‌সরা আদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য নানা সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ও সজ্জীকৃত, খ্রীষ্টবাদী ও মোসলমানদিগের স্বর্গলোকও এইরূপ পার্থিব সুখ সামগ্রীতে পূর্ণ। তাঁহারা সকলেই পৃথিবীস্থ আপন আপন প্রিয় বস্তু দ্বারা কল্পনাবলে স্বর্গকে সাজাইয়াছেন, পৃথিবীর রং এ স্বর্গকে রঞ্জিত করিয়াছেন, এই প্রকার স্পষ্ট প্রতীতি হয়। এরূপ স্বর্গ ঘোর বিষয়ী ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের সুখধাম হইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বিষয়বিরাগী পুণ্যাত্মা জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ঈদৃশ স্বর্গকে নরকলোক মনে করেন। স্বর্গেও যাইয়া ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, সুরা ও বেশ্যাদ্বারা সেবিত হওয়া কি ভয়ঙ্কর কথা? যে দেশের যে সমস্ত লোকের যে বস্তু সমধিক প্রিয় ও আদরণীয়, তাঁহারা তাহা পৃথিবীতে পর্য্যাপ্তরূপে সম্ভোগ করিতে পারেন না, কল্পনাশক্তি প্রভাবে সেই সকল বস্তু দ্বারা তাঁহারা স্বর্গরচনা করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়। আরব্য মরুভূমিনিবাসী

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরা বলেন, স্বর্গলোকে ইতস্ততঃ নির্ম্মল-সলিলা পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, সুশীতল ছায়াপ্রদ ঘন-সন্নিবিষ্ট পাদপরাজির মনোহর উদ্যান সকল বিদ্যমান, সেখানে শত শত পরমা সুন্দরী দিব্যাঙ্গনা পুরুষদিগের সেবার জন্য লালায়িত। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বলেন, স্বর্গে ভুবনমোহিনী অপ্সরা কিন্নরীগণ নিয়ত গীত বাদ্যে রত, তাঁহারা নানা রূপে পুরুষদিগের সেবা করিয়া থাকেন, তথায় ইতস্ততঃ সুরার নদী প্রবাহিত। এই প্রকার নানা বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভগবানের আলোক লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা এরূপ স্বর্গকে শারীরিক সুখপ্রিয় লোকদিগের কল্পনারচিত ভিন্ন অন্য কি বলিবেন? নরক লোকসম্বন্ধেও ঈদৃশী কল্পনা। পাপীকে যমদূত নিরন্তর লৌহ মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিতেছে, পাপীর দেহ চির প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতেছে, কোথাও সর্প বৃশ্চিক কৃমি পাপীকে দংশন করিতেছে, এরূপ বর্ণনা। নরকে পাপীর প্রতি অবিরাম শাস্তি, ভয়ানক তীব্র দণ্ড, এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া অনেক ধর্ম্ম প্রচারক অজ্ঞ সামান্য লোকদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, এবং আপনাদের দল পুষ্ট করেন। মৃত্যুর পর যখন আত্মার এই ভৌতিক দেহ থাকিবে না, তখন তাহার ভৌতিক শাস্তি, ভৌতিক যন্ত্রণা কিরূপে সম্ভব? আত্মা অমর, মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ নাই; দেহাচ্ছাদিত জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে দেহের যেমন কিছুই ক্ষতি হয় না, যেমন বাহনচ্যুত হইলে আরোহী যেমন ছিল তেমনই থাকে, রুগ্ন জীর্ণ দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া আত্মা তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ থাকে,

ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শরীর ও বস্ত্র, আরোহী ও বাহন, যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র পদার্থ, দেহ ও আত্মা তদ্রূপ স্বতন্ত্র বস্তু। বরং দেহ ও আত্মা এই উভয়ের উপাদান পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন, দেহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভৌতিক বস্তু, আত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম চৈতন্য পদার্থ। জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইহা নিরাকার ও অনাধিভৌতিক।

পরলোকসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা এই মাত্র জানি আত্মা অমর, মৃত্যুর পর আত্মা স্থিতি করিবে। তাহার অনন্ত উন্নতি। ঈশ্বর প্রেমময় মঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান্; তিনি পাপ ও পুণ্যের জন্য আত্মাকে দণ্ডিত ও পুরস্কৃত করিয়া তাহার উন্নতি ও কল্যাণ 'বিধান করিবেন। মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা কোথায় কি অবস্থায় থাকিবে তাহার প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। সে বিষয়ে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যবনিকা স্থাপিত। তাহার ভিতরে দৃষ্টির প্রবেশ নাই, তদ্বিষয়ে আমরা অন্ধ, তাহার কোন কথা বলা অনধিকার চর্চ্চা। সেই পরলোকযবনিকার অভ্যন্তরের কথা বলিতে গেলেই কল্পনা করিয়া বলিতে হয়। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, পার্থিব ব্যাপারে নিয়ত ব্যাপৃত, পৃথিবীর বিষয় দেখি, শুনি, ভাবি; সুতরাং পৃথিবীর বস্তুসংযোগে কল্পনাবলে পরলোক রচনা করি। মনে কর মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের চিন্তাশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি আছে, তাহাকে কেহ প্রশ্ন করিল পৃথিবী কি রূপ? সে পৃথিবী কখন দেখে নাই, পৃথিবীর তত্ত্ব কিছুই রাখে না, পৃথিবীতে পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু লাভ করা যায়, কত সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বস্তুতে ধরাতল পূর্ণ; সূর্য্য চন্দ্রমণ্ড

উদয়াস্ত ও দিবা রাত্রি হইতেছে, সে তাহার কিছুই জানে না। সে যদি পৃথিবীর বিষয় বর্ণনা করে, কল্পনাবলে বর্ণনা করিবে। যে বস্তু সে দেখিতেছে ও ভোগ করিতেছ তাহাই তাহার কল্পনার বিষয় হইবে, সেই সকল উপাদান বৃহদাকারে গ্রহণ করিয়াই সে পৃথিবী রচনা করিবে। সে বলিবে, পৃথিবীতে বড় বড় মোটা মোটা নাড়ী আছে, প্রবল বেগে রস রক্তের স্রোত চলে ইত্যাদি, আর কি বলিবে? বাস্তবিক পরলোকে না যাইয়া পৃথিবীতে থাকিয়া যাদের পরলোকের বর্ণনা, গর্ভস্থ ভ্রূণের পৃথিবীর বর্ণনার ন্যায় হইয়া থাকে। যে বিষয়ে জ্ঞানালোক ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ করেন নাই, সে বিষয়ে কোন কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। বলিতে গেলে অনধিকার চর্চ্চা হয়, অনেক ভ্রান্ত মত ও অলীক উক্তি দ্বারা লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে হয়। "কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। "স্বর্গে কিরূপ সুখরত্ন আছে, কে জানে? স্থূলদর্শী লোক স্থূল বিষয়ই ভাবে ও দেখে, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম চিন্ময় লোকের তত্ত্ব এই পৃথিবীতে থাকিয়া সে কি বুঝিবে?

জীবাত্মা এই স্থূল পৃথিবীতে যেমন স্থূল দেহ ধারণ করিয়া স্থিতি করে ও তৎসাহায্যে জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, অনেকের এইরূপ সংস্কার ও বহু শাস্ত্রের এইরূপ মত যে, এই স্থূল দেহচ্যুতির পর আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহ, কেহ কেহ বলেন বৈদ্যুতিক দেহ আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে। একেবারে নিরাশ্রয় নিরবলম্বভাবে জীবাত্মা কখন থাকে না। সেই সূক্ষ্ম আকৃতি পার্থিব আকৃতির অনুরূপ হয়। ঈশ্বর যেমন জগতের ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, এবং স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ

করিতেছেন, জীবাত্মাও কোন না কোনরূপ দেহ বা আকার অবলম্বন করিয়া জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আবার অনেকের মত এই যে, আত্মা কোনরূপ আকার আশ্রয় করে না, নিরবলম্বভাবে স্থিতি করে। এই সকল মতামতের উপর কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। পাঠক বিচার করিয়া বুঝিবেন।

পরলোকে গুরুজন ও প্রেমাস্পদ আত্মীয় বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ আশা প্রায় সকলের মনে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। প্রেমময় ঈশ্বর যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়া অন্নজল প্রদানে ক্ষুধিত ও তৃষিতকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আশান্বিতকে পরিতৃপ্ত করেন, নিরাশ করেন না। পৃথিবীতে যেমন অযোগ্য বিষয়ে যাহারা আশা ও লালসা স্থাপন করে, তাহারা সচরাচর নিরাশ ও বঞ্চিত হয়; তদ্রূপ অযোগ্য আশা পরলোকে ফলবতী হইবে সম্ভব নহে। পার্থিব বিষয়ে সেই অতীন্দ্রিয় লোকে নিরাশ হইতে হইবে। পার্থিব সম্বন্ধ সেখানে থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি? এখানেই অনেকের সঙ্গে দুই চারি দিন পরে পার্থিব সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া যায়। পরস্পরের সঙ্গ সুখকর বোধ হয় না, সাক্ষাৎ আলাপ বন্ধ হয়। পরলোকে যে সেই ভাব হইবে না বিচিত্র কি? এই পৃথিবীতে থাকিয়াই পরলোকগত মহাত্মাদিগের সঙ্গে, বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইতে পারে, সেই সম্মিলন আধ্যাত্মিক, উহা ভাবেতে ও চরিত্রেতে হয়। আমি যদি একান্ত ঈশ্বর ইচ্ছার অনুগত হই, তাহা হইলে ঈশ্বর পুত্র ঈশার সঙ্গে আমার সম্মিলন হইল; আমার প্রবৃত্তির নির্ব্বাণ হইলে বুদ্ধদেবের সঙ্গে, প্রেমে মত্ততা হইলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে

সম্মিলন হয়। কোন বন্ধুর ইচ্ছা ও ভাবের অনুসরণ করিয়া চলিলে আমি তাঁহার সঙ্গে ভাবেতে মিলিত হই। জীবাত্মা সকল ইহলোকে যেমন পরমাত্মার ক্রোড়ে বাস করেন, পরলোকেও তাঁহাতেই স্থিতি করেন। কিন্তু ইহাতে পরলোকগত স্বচেতন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসিয়া আমাতে উপস্থিত হন, ইহা বলা যাইতে পারে না। পৃথিবীস্থ এক বন্ধু অন্য বন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের নিকটে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া পরস্পর ভাবের বিনিময় করেন, এক অন্যের সহানুভূতি ও সহায়তা করেন, পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পৃথিবীস্থ আত্মার সেইরূপ সচেতন ব্যক্তিগত যোগ সচরাচর হয় ঠিক বলা যায় না। ইহা কেবল চিন্ময় পরমেশ্বরেরই সঙ্গে হইতে পারে, কেন না তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ। কোন জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী নহেন, যে ডাক শুনিয়া কাছে আসিয়া দেখা দিবেন ও কথা কহিবেন। তবে ইহলোকের ন্যায় পরলোকে প্রেমের আকর্ষণে আত্মা সকল পরস্পর সচেতন ব্যক্তিরূপে সম্মিলিত হইবেন, দেখা সাক্ষাৎ ও ভাবের বিনিময়াদি করিবেন, এরূপ আশা আছে। তখন এরূপ জড়দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি থাকিবে না, কেমন করিয়া ঈদৃশ ব্যক্তিগত সম্মিলন সাধিত হইবে, জানি না। হইবে, ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায়। যাহাতে এ কার্য্য সাধিত হয় সেরূপ তিনি অন্য প্রকার শক্তি দান করিবেন। যিনি প্রেম অনুরাগ জ্ঞানলাভস্পৃহা অন্তরে প্রদান করিয়াছেন, তিনি সে সকলকে বৈধরূপে চরিতার্থ হইতে দিবেন, অচরিতার্থ রাখিবেন না। তাঁহার স্বজিত বিচিত্র বিশ্বের—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির যে কত শোভা ও সৌন্দর্য্য, তাহাতে তাঁহার

কত মহিমা ও করুণার ব্যাপার রহিয়াছে, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না; অথচ তাহা জানিবার ইচ্ছা অন্তরে বলবতী রহিয়াছে, তিনি তাহা কখন অচরিতার্থ রাখিতে পারেন না। মানুষের অনেক উচ্চ বিষয়ে আশা ও অভিলাষ আছে, ইহলোকে তাহার চরিতার্থ হয় না, অনেক আধ্যাত্মিক ভাব আছে যে, এখানে তাহার প্রকৃত উন্মেষ হয় না, ইহলোকে অনেক পাপীর যথার্থ শাস্তি হইয়াছে অনেক পুণ্যাত্মা পুণ্যের পুরস্কার পাইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় না। পরম ন্যায়বান্ প্রেমময় বিশ্বপতি কিছুই অবিচার করেন না, কিছুই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে যাহা অপূর্ণ আছে অপরলোকে তাহা পূর্ণ করিবেন, এই ধ্রুব বিশ্বাস। আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে আত্মার অনন্ত কাল স্থিতি, তাহার তুলনায় ইহলোকে তাহার স্থিতি ক্ষণকালমাত্র।

প্রকৃত দণ্ড পুরস্কার দেহেতে নয়, আত্মাতে। অনুতাপ ও আত্মগ্লানিই পাপের শাস্তি, ইহা দেহেতে হয় না, আত্মাতে হয়। এই শাস্তি পাইয়া পাপী সংশোধিত হইয়া নবজীবন লাভ করে। পুণ্যের পুরস্কার আত্মপ্রসাদ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ। ইহা দেহ না থাকিলেও হইতে পারে। অনেকের পক্ষে ইহলোকে এই দণ্ড পুরস্কার হয় না, মৃত্যুর পর পরলোকে হইয়া থাকে। ন্যায়বান্ বিচারপতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, প্রত্যেক পাপীকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন, পুণ্যাত্মাকে পুরস্কৃত করেন, তাহাতে কিছু মাত্র ভুল নাই।

এ যাহা কিছু বলা হইল তাহা বাহিরের কথা। যথার্থ পরলোক—স্বর্গলোক অন্তরে। দেবনন্দন ঈশা বলিয়াছেন, "তাঁহারা

বলিবে না যে, স্বর্গ রাজ্য এখানে বা ওখানে, কারণ দেখ স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের অন্তরে।" বাস্তবিক অন্তরেই প্রকৃত স্বর্গ বা পর-লোক। বিশ্বাসী এই পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই পরলোকে স্থিতি করেন। যখন আত্মা সংসার ছাড়িয়া ব্রহ্মযোগে যুক্ত ও ব্রহ্ম-সত্তাতে নিমগ্ন হয় তখনই তাহার স্বর্গবাস হইয়া থাকে। তিনিই আমাদের স্বর্গ, তিনিই মোক্ষধাম, তাঁহাকে লাভ করিলে স্বর্গ-লাভ, দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়; তাঁহাকে ছাড়িয়া পাপে নিমগ্ন হইলেই নরকযন্ত্রণা ভোগ। ব্রহ্মানন্দসম্ভোগ ও ব্রহ্মসহবাসরূপ স্বর্গসুখ ভিন্ন নববিধানবাদী অন্য স্বর্গকামনা করিতে পারেন না। সেই পরলোক, শ্রেষ্ঠ লোক, ব্রহ্মলোক জীবাত্মার প্রকৃত বাস-স্থান। এই অধ্যাত্ম লোকে ব্রহ্মচরণতলেই সাধু সাধ্বীদিগের সঙ্গে প্রকৃত যোগ হয়, সেই সম্মিলনেই প্রেমপরিবার গঠিত হয়। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন যেন কল্পিত স্বর্গলোক কামনা পরিত্যাগ করিয়া, এই প্রকৃত স্বর্গলোকে প্রবেশের জন্য আমরা প্রস্তুত ও উপযুক্ত হই।

আমাদের সার মত ও বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীতে জীবাত্মার প্রথম জন্ম। তাহার পুনর্জ্জন্ম বা পুনরুত্থান হয় না। মৃত্যুর পর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকে অনন্তকাল স্থিতি করে, এবং পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত দণ্ড হয় না।

পরলোকসম্বন্ধে সহজ জ্ঞান সহজ প্রত্যাদেশ সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে সেই জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া কল্প-নার তুলিতে নিজের নিজের ইচ্ছামত এক এক অদ্ভুত পরলোক

চিত্রিত করে। এক মহাপুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, আমি শৈল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নির্ম্মল জলস্রোত বাহির কার, পৃথিবীর জঞ্জাল মিশ্রিত হইয়া তাহাকে কলুষিত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তোমাদের আত্মার কুশল কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেরণ করি, তোমরা তাহার সঙ্গে স্বীয় মনঃকল্পিত ভাব মিশ্রিত করিয়া সত্যকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ।

সেবাব্রত।

বিশ্বপতি পরমেশ্বর সেবাব্রতে নিত্যব্রতী। তাঁহার মত পর-সেবা কে করিতে পারে ? তিনি সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী হইয়া প্রবল প্রেমভরে নানা ভাবে নিরন্তর অসঙ্খ্য জীবের সেবা করি-তেছেন। তাঁহার অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার সাধু অসাধু ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলের জন্য প্রমুক্ত, তাঁহার সদাব্রত হইতে কখন কেহ বঞ্চিত হয় না। তিনি গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া প্রসন্ন বদনে সকলকে যথোপযুক্ত অন্ন জল বস্ত্র রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করেন, এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞান অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই সেবা-ব্রত কোন বিঘ্ন বাধায় কখন প্রতিহত হয় না, কোন দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী অত্যাচার করিয়া তাঁহার স্নেহ প্রেমকে খর্ব্ব করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মপ্রেমিক ও ব্রহ্মভক্ত, তিনি ব্রহ্মকে আদর্শ করিয়া চলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ব্রহ্মভক্ত সেবাব্রতে ব্রতী না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া পর দুঃখে দুঃখী হন, পরকে সুখী করিবার জন্য

সেবাব্রত আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ভগবানের অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে এইরূপ পরসেবা সাধনকেই ভগবানের প্রিয় কার্য্যসাধন বলা যায়। সেবাব্রতে ব্রতী এই সেবাতেই আপনার পাপক্ষয় ও পরিত্রাণ, এইরূপ বিশ্বাস করেন। বিনয়নিষ্ঠা না থাকিলে, আমি নীচ দাস যাঁহাদের সেবা করি তাঁহারা আমার প্রভু, আমি তাঁহাদের সেবা করিয়া পবিত্র হইব, পরম সেবক ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিব, অন্তরে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী না হইলে প্রকৃত পরসেবা হইয়া উঠে না। ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া যিনি পরসেবা করেন, তাঁহার অন্তরে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শান্তি সন্তোষ থাকে। প্রকৃত সেবক সেব্য জনের কোন ত্রুটি দেখিলে বিরক্ত ও অধৈর্য্য হন না। তিনি সেবায় আপনার ত্রুটি ও অযোগ্যতা দেখিয়াই সময়ে সময়ে দুঃখিত হন। তিনি সেবা করিয়া আমি অনুগ্রহ করিলাম, এরূপ মনে করেন না, বরং আমি ধন্য হইলাম, পবিত্র হইলাম, এই প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত সেবায় সেবকের পুণ্য হয় না, জীবনে কোন ফল হয় না, তাঁহার পণ্ডশ্রম মাত্র হয়, বরং তাহাতে তাঁহার পাপবৃদ্ধি হয়। সেবক আপনাকে বড় মনে করিলে সেব্য জনের প্রতি তাঁহার তাচ্ছিল্য ভাব থাকিলে তিনি এই পবিত্র মহাব্রত সাধনের কোনরূপে উপযুক্ত হন না। অনিচ্ছা বিরক্তিবশতঃ কঠোর কর্ত্তব্য বোধে, সাংসারিক ভাবে মায়া ও আসক্তিতে সেবার কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য নাই, ঈশ্বরের নিকটে সেই সেবার কোন মূল্য নাই। যিনি সেব্যের জীবনে ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল অন্তরে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি ভ্রাতা ভগিনীর সেবা করিয়া

ব্রহ্মসেবা করিলাম বলিয়া আপনাকে ধন্য ও পবিত্র মনে করেন। এরূপ সেবকের মস্তকে ভগবান্ স্বর্গের মুকুট অর্পণ করিয়া থাকেন। এরূপ সেবক সর্ব্বদা বিনীত প্রশান্ত ও প্রফুল্ল ভাব প্রদর্শন করেন।

অন্যের অভাব মোচন, ক্লেশনিবারণ ও সুখসম্বর্দ্ধন সেবার উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে নানা প্রণালীতে হইতে পারে। অজ্ঞানীকে জ্ঞান, পাপাচারীকে ধর্ম্মোপদেশ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, দীন দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দান, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দান ও প্রতিপালন ইত্যাদি নানা কার্য্য ব্রহ্মপ্রীতি উদ্দেশ্যে করিয়া পরের দুঃখ লাঘব ও সুখবৃদ্ধি করিলে যথার্থ সেবাব্রত পালন হয়। সমুদায় না হউক, এ সকলের কোন না কোন কার্য্য মনুষ্যমাত্রই করিতে সক্ষম। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশেষ ইঙ্গিত বুঝিয়া চিরজীবনের জন্য বিশেষ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাহার সাধুসেবা কাহার বা ধর্ম্মোপদেশ দান স্বীয় জীবনের বিশেষ ব্রত হয়। কেহ বা দীন দুঃখীকে আশ্রয় দান ও ভরণ-পোষণ করাকে স্বীয় জীবনের বিশেষ ব্রত করিয়া লইয়া থাকেন। কোন কোন লোক রোগীর সেবা শুশ্রূষা করাই চিরজীবনের ব্রত বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে এইরূপ বিশেষ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাতে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকেন, এবং লোকের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রচুর প্রাপ্ত হন। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ। খৃষ্টীয় মণ্ডলীর অন্ত-র্গত বহু দেবাত্মা নরনারী জীবনের বিশেষ সেবা ব্রত সাধনে

যেরূপ ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের পদ-ধূলি সংস্পর্শে জীবন পবিত্র হয়। ব্রাহ্মেরা কি তাঁহাদের চরণ প্রান্তে বসিবারও উপযুক্ত ? কত ঈশ্বরগত প্রাণ খ্রীষ্টীয় উপদেষ্টা পার্থিব সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখী দীনবেশে ধর্ম্মবিমূঢ় হিংস্র পশুতুল্য বর্ব্বরদিগের সেবা চিরজীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন; কত মহাত্মা অরণ্যে বর্ব্বরপ্রদেশে বিষম নিগ্রহ লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া বর্ব্বরদিগের নির্দ্দয় আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহি-য়াছে। মহাত্মা ফাদার দামিয়ান কুষ্ঠরোগীর সেবা চিরজীবনের ব্রত করিয়া কুষ্ঠোপনিবাস দুর্গম দ্বীপে বহু বৎসর প্রাণপণে আনন্দ উল্লাস ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে একাকী শত সহস্র কুষ্ঠরোগীর কেমন অদ্ভুত সেবা করিলেন, পরে নিজে গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া সেবকের জীবন কিরূপ হইতে হয় তাহার অলৌকিক দৃষ্টান্ত রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডনিবাসী বৃদ্ধ মহাত্মা মুলার সাহেব এবং মুক্তি ফৌজের পুণ্যাত্মা অধিনা-য়ক জেনেরেল বুথ ও তাঁহার সাধু সহচরগণ কেমন অলৌকিক পরসেবা ব্রতের পরিচয় দান করিতেছেন, তাহা কে না জানেন ? এই কলিকাতা মহানগরীতে Little Sisters of the poor (দুঃখী উপায়হীনের ক্ষুদ্র ভগিনীগণ) দুরারোগ্য নিরাশ্রয় রোগীর সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা এ কার্য্যে কি অপূর্ব্ব যত্ন অধ্যবসায় ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা ইয়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা হইয়া দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া রোগীদিগের

ঔষধ পথ্য দিতে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, এবং নিজেরা পরিশ্রম সহকারে শিল্পকার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক রোগীর সেবাতে ব্যয় করিয়া থাকেন। স্বহস্তে রোগীদিগের মল মূত্র পরিষ্কার করেন, তাহাদের শয্যা পাতিয়া দেন, মাতৃতুল্য আদর স্নেহ ও যত্ন পূর্ব্বক প্রসন্নবদনে তাহাদিগকে খাওয়ান ও পরান, এবং ধর্ম্মোপদেশ সঙ্গীত ও প্রার্থনা দ্বারা তাহাদের মনে সান্ত্বনা দান করেন। রোগীদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহে রাখিয়া নিজেরা সামান্য গৃহে বাস করেন। রোগীর সেবায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, নিজের ভাবনা কিছুই ভাবেন না। সেই সকল রোগী কি তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব? তাহা নয়। অনেককেই নগরের পথে কুড়াইয়া পাওয়া হইয়াছে। এই সকল পরসেবাব্রত-ধারিণী পুণ্যবতী নারী ধরাতলে মূর্ত্তিমতী দেবী, ইঁহাদের কি অলৌকিক প্রেম দয়া যত্ন সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়! ইঁহাদিগকে দর্শনে মহা পুণ্য। যিনি পরসেবা করিতে যাইয়া শত্রুর উৎপী-ড়নে মহাকষ্টে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শত্রুর কল্যাণের জন্য পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, এই সকল দেবী সেই মহর্ষি ঈশারই যথার্থ অনুগামিনী শিষ্যা।

মোসলমান সাধকদিগের মধ্যেও পরসেবার অতি উচ্চ জলন্ত দৃষ্টান্ত সকল বিদ্যমান। বল্‌খ রাজ্যাধিপতি মহারাজ এব্রাহিম আদহম রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহা সাধক ও পরম প্রেমিক বৈরাগী হন। সেই অবস্থায় তিনি ধর্ম্মবন্ধুদিগের সেবা করা স্বীয় জীবনের বিশেষ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। একদা সেই মহাত্মার এক জন ধর্ম্মবন্ধু পীড়িত হইয়া পড়েন,

তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দেহ মন ঢালিয়া দেন। যে গৃহে রোগী রজনী যাপন করিতেছিলেন, সেই গৃহে কবাট ছিল না, অত্যন্ত হিমের রাত্রি ছিল ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, রোগীর গাত্রে শীতল বায়ুর সংস্পর্শ না হয়, এই উদ্দেশ্যে সাধু এব্রাহিম সমগ্র রজনী দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার আবরণস্বরূপ হইয়াছিলেন। একদা এক ধর্ম্মবন্ধু সহ মহাত্মা এব্রাহিম কোন দূর দেশে যাইতেছিলেন, পথে বন্ধু গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। তিনি তাঁহার চিকিৎসা শুশ্রূষাতে সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমুদায় ব্যয় করিয়া ফেলেন, অবশেষে আরোহণের জন্য যে একটি গর্দ্দভ ছিল তাহাও বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য রোগীর সেবায় ব্যয় করেন। রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে প্রস্থান করা আবশ্যক হয়, কিন্তু তিনি চলৎ শক্তিহীন, এ দিকে বাহনও নাই। ব্রতধারী এব্রাহিম তাঁহাকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া আনন্দে তিন দিনের পথ চলিয়া যান। মক্কা নগরে অবস্থিতি করিয়া এব্রাহিম প্রতিদিন মুটের কাজ করিতেন, সমস্ত দিন খাটিয়া যাহা কিছু পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন তদ্দ্বারা আটা ক্রয় করিতেন, স্বহস্তে রুটী প্রস্তুত করিয়া দিনান্তে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক খাওয়াইতেন, পরে নৈশিক উপাসনান্তে নিজে ভোজন করিতেন। এই তাঁহার প্রাত্যহিক ক্রিয়া ছিল, তাহাতে তাঁহার পরম আনন্দ ছিল। ভ্রাতঃ, ভাবিয়া দেখ কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি বল্‌খ রাজ্যাধিপতি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী ছিলেন, তিনি নীচ মুটের কাজ করিয়া তদুপার্জ্জিত অর্থে শ্রদ্ধাসহকারে কতকগুলি সামান্য শ্রেণীর ফকিরের সেবা করিতেন, কেমন বিচিত্র বৈরাগ্য ও উচ্চ সেবাব্রত! মোসলমান সাধকমণ্ডলীর মধ্যে এমন এক এক জন

মহাত্মা ছিলেন যে, তাঁহারা কেবল ধর্ম্মবন্ধু, সাধকদিগের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়া সেবা করিতেন। অন্ন বস্ত্রাদির ব্যস্ততায় ও চিন্তায় সেই সাধকদিগের সাধনার বিঘ্ন না হয় এই বিষয়ে সেই সেবকদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রীতির সহিত এইরূপে সেবা করাই তাঁহাদের চিরজীবনের বিশেষ ব্রত হইয়াছিল। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মবন্ধু সাধকদিগের জন্য অন্নবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেন। প্রতিদিন তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধুদিগের গৃহদ্বারে যাইয়া কোন্ কোন্ বস্তুর অভাব, এই অনুসন্ধান লইতেন ও অবিলম্বে সেই অভাব মোচন করিতেন। বন্ধুর সেবা করিতে পারিলে আপনারা কৃতার্থ হইতেন। স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুর সমুদায় তত্ত্ব লওয়া, সুখ দুঃখে সহানুভূতি করা, বন্ধুর দোষ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করা, ব্রতধারী সেবকদিগের বিশেষ কার্য্য ছিল। অন্ততঃ তিন দিবস অন্তে বন্ধুর তত্ত্ব লওয়া বিধি ছিল। বন্ধুর নিকটে গর্ব্বিত হইলে তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে পবিত্র সেবার কার্য্য হইয়া উঠে না। মোসলমান সেবকগণ ধর্ম্মবন্ধু প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইবার পূর্ব্বে নিষ্কাম হইয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন, প্রফুল্লতা ও প্রশস্ত ললাটে সেবা করিতেন। একজন সাধকের মৃত্যু হইলে পর এক ব্রতধারী সেবক যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন পরম যত্নে সেই সাধকের উপায়হীন স্ত্রী পুত্র কন্যার সেবা করিয়াছিলেন। ইহুদি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মুসা যখন মেসরাধিপতি দুরাত্মা ফেরউণের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে ঈশ্বরের আদেশে স্বজাতি এস্রায়িল সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া কেনানাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন সেই এস্রায়িল্ বংশীয় উচ্ছৃঙ্খল লোক সকল উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রীর অভাবে

পথে মুসা দেবকে গালি দেয় ও অপমান করে, এবং অন্যান্য ক্লেশ দান করে, ব্রহ্মধারী পরম হিতৈষী মুসাদেব শান্ত ভাবে সে সমুদায় অত্যাচার বহন করিতেছিলেন, তিনি কোন উপায় না দেখিলে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেন। মহাপুরুষদিগের এইরূপ উচ্চ সেবাব্রত ছিল। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মদিগের অর্থব্যবহার।

কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন যে, "টাকা পয়সা বৃশ্চিক সদৃশ, যে পর্য্যন্ত মন্ত্র শিক্ষা না হয়, তাহাকে স্পর্শ করিও না, করিলে তাহার বিষ তোমাকে বিনাশ করিবে। মন্ত্র কি? তাহা বৈধরূপে উপার্জ্জন, ন্যায়পথে ব্যয়।" কথিত আছে, যখন টাকার সৃষ্টি হইল, তখন শয়তান টাকাকে হস্তে গ্রহণ করিয়া সাদরে চুম্বন করিল, এবং বলিল, "তোর প্রতি যাহারা আসক্ত হইবে তাহারা আমার দাস হইবে, তাহাদিগের দ্বারা আমি নরকলোক পূর্ণ করিব।" অপিচ উক্ত হইয়াছে যে, যখন মোহম্মদীয় ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় নরনারী প্রবৃত্ত হইল, তখন নরকলোকাধিপতি শয়তানের সৈন্যবৃন্দ মহাত্রাসে স্বীয় প্রভুর নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আপনার রাজ্য আর রক্ষা পায় না, একেশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইল, সকলে পাঁচ বার করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করে, আর উপায় নাই।" শয়তান জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি; যাহারা এরূপ ঈশ্বরোপাসনা করে তাহাদের ধনের

প্রতি—টাকার প্রতি আসক্তি আছে কি না?" অনুচরগণ বলিল, "পনর আনারও অধিক লোকের ধনের প্রতি—সংসারের প্রতি প্রবল আসক্তি।" ইহা শুনিয়া শয়তান সগর্ব্বে বলিল, "তাহাদের পূজা উপাসনায় কিছুই হইবে না, এক ধনাসক্তিযোগে আকর্ষণ করিয়া আমি সকলকে নরকলোকে লইয়া যাইব।"

আসক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অর্থ স্পর্শ ও অর্থ ব্যবহার করিলে, তাহাতে জীবনে বিষ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকাম হইয়া অনাসক্ত হৃদয়ে অর্থ ব্যবহার করিলে, ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয় করিলে জীবনে অমৃত সঞ্চারিত হয়, স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ধনে নরক ও স্বর্গ, দুই স্থিতি করিতেছে। আমাদের আচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভক্তের নিকটে টাকা স্বচ্ছ কাচের ন্যায়, তাহাতে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসী ভক্ত টাকা স্পর্শ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করেন, কিন্তু অভক্ত অর্থ স্পর্শ করিয়া কলুষিত হয়। এমন ব্রাহ্ম আছেন কি না জানি না যে, টাকার মধ্যে স্বর্গ দর্শন করেন, ভগবানের হস্ত হইতে ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিদেশে তাঁহার প্রীত্যর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। বরং ইহার বিপরীতই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মের ধর্ম্মার্থ দান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেবল নিজের ভোগ সুখের জন্য তাঁহাদের অর্থসঞ্চয় ও ব্যয় হয়। হিন্দু সমাজের লোকেরা বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে কত প্রচুর অর্থ দান করেন। হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া সাধারণতঃ নরনারী কেবল নিজের সুখ সচ্ছন্দতা বিলাসিতার জন্য অর্থ বিসর্জ্জন করিতেছেন, এরূপ লক্ষিত হয়। ধর্ম্মার্থ মাসান্তে বা বৎসরান্তে অনেকে 'এক টা

পয়সাও ব্যয় করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা অতি-শয় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। মোসলমানেরা নির্দ্দিষ্ট আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মার্থ দান করিয়া থাকেন, অনেক ব্রাহ্ম সহস্র ভাগের এক ভাগও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করিতে কুণ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে কেমন উদার বদান্যতা। তাহার তুলনায় সদ্ব্যয়বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের কি ভয়ঙ্কর হীনতা ও নীচতা। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মেরই অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তথাপি নিজের অবস্থানুযায়ী অধিক হউক বা যৎকিঞ্চিৎ হউক নিয়মিতরূপে ধর্ম্মার্থ দান করা সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। যিনি অধিক সমর্থ না হন, অন্ততঃ প্রতিদিন পরসেবার জন্য এক মুষ্টি তণ্ডুল ধাণিয়া'ও দিতে পারেন। এ সকল উচ্চ বিষয়ে দৃষ্টি ব্রাহ্মদের প্রায় কাহারও নাই, বরং ইহার বিপরীত দিকে অনেকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি। ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সময় সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের ২ বা ৪৲ বার্ষিক মূল্যের তত্ত্ব-জ্ঞানোদ্দীপক সাময়িক পত্রিকা খানা বন্ধ করা, প্রচারার্থ দান দুই আনার পয়সা বজিত করা হয়। অনেকে পুস্তক পত্রিকাদি গ্রহণ করিয়া একেবারে মূল্যই প্রদান করেন না, বড়ই শোচনীয় অবস্থা। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করা অর্থাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ও সত্যতা পালন করা, বহু ব্রাহ্মই এই নীতির অনুসরণ করেন না। ব্রাহ্মদিগের অর্থ ব্যবহার বিষয়ে এরূপ অনীতি ও দুর্নীতির কথা দুঃখের সহিত আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হই-তেছে। কিন্তু সকল ব্রাহ্ম আমাদের এই উক্তির লক্ষ্য নহেন।

ধর্ম্মপ্রচার যাঁহাদের জীবনের ব্রত তাঁহাদের অর্থ ব্যবহার অত্যন্ত উচ্চনীতিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। বিধাতার বিধি এই

যে, তাঁহারা নিজের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিবেন না, নিজের জন্য অন্যের দান স্পর্শ করিবেন না। প্রচারসম্বন্ধীয় কার্য্যে প্রতিদিন প্রেরিতগণ প্রচুর পরিশ্রম করিবেন, প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যে সপরিবারে প্রতিপালিত হইবেন, জীবনে ইহার অন্যথা করিলে তাঁহারা পতিত হন। তাঁহারা সপরিবারে সর্ব্বথা বিলাস ত্যাগ ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। যাঁহারা প্রচার কার্য্য করেন, প্রচার ভাণ্ডারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, নিজের জীবিকার জন্য যাচ্ঞা করা বা অন্য উপায় অবলম্বন করা পাপ মনে করেন, প্রচারভাণ্ডার হইতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের অভাব মোচন হইবে। কেন না প্রচারার্থ সাধারণের দান বিষয়বিরাগী প্রচারকদিগের ভরণপোষণে প্রথমতঃ ব্যয়িত হওয়া স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত। স্বর্গগত প্রচারকের নিরাশ্রয়া বিধবা পত্নী ও অসহায় বালক বালিকাও এই বিধি ও নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রগণ কর্ম্মক্ষম উপার্জ্জনশীল হইলে এই ব্যবস্থাবিষয়ে বিবেচ্য। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের সহায়তা ও স্বীয় শ্রমার্জ্জিত অর্থ প্রচারভাণ্ডারে সমর্পণ করিলে ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের যথোপযুক্ত সাহায্য হইতে পারে। প্রচারভাণ্ডারের অর্থ অপাত্রে প্রদত্ত হওয়া অতি দূষ্য। প্রচারকগণ অর্থব্যবহারে উচ্চ নীতি উচ্চ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। সামান্য বিষয়ী ব্রাহ্মের ন্যায় তাঁহারা অর্থ ব্যবহার করিতে পারেন না।